মাসুদ রানা

সেই পাগল বৈজ্ঞানিক

কাজী আনোয়ার হোসেন

চৈত্র মাসে তুষারপাত শুরু হয়েছে
ঢাকা, রিয়াদ, নিউ ইয়র্ক ও লন্ডনে।
অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় ব্যাপার!
প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শত শত মানুষ মরছে।
প্রকৃতির রুদ্ররোষ থেকে বাঁচতে
শহর ছেড়ে পালাচ্ছে সবাই।
কিন্তু প্রকৃতি নয়, এ জন্যে দায়ী রানার
চিরশত্রু এক পাগল বৈজ্ঞানিক।
দাবি না মানা হলে বিশ্বকে বরফ যুগে নিয়ে যাবে সে।
ওদিকে শত্রুপক্ষের ডেথ মেশিন ও ফোর্স ফিল্ড
কাজ শুরু করে দিয়েছে।
সোহানাকে নিয়ে নিকারাগুয়া ছুটল মাসুদ রানা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় * ভারতনাট্যম * স্বর্ণমৃগ * দুঃসাহসিক * মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা * দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর * সাগরসঙ্গম * রানা! সাবধান!! * বিস্মরণ * রত্নদ্বীপ * নীল আতঙ্ক * কায়রো মৃত্যুপ্রহর * গুপ্তচক্র * মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র * রাত্রি অন্ধকার * জাল * অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা * ক্ষ্যাপা নর্তক * শয়তানের দূত * এখনও ষড়যন্ত্র * প্রমাণ কই? বিপদজনক * রক্তের রঙ * অদৃশ্য শত্রু * পিশাচ দ্বীপ * বিদেশী গুপ্তচর * ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা * তিনশত্রু * অকস্মাৎ সীমান্ত * সতর্ক শয়তান * নীলছবি * প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক * এসপিওনাজ * লাল পাহাড় * হৃৎকম্পন * প্রতিহিংসা * হংকং সম্রাট কুউউ * বিদায় রানা * প্রতিদ্বন্দ্বী * আক্রমণ * গ্রাস * স্বর্ণতরী * পপি * হি শসী * আমিই রানা সেই উ সেন * হ্যালো, সোহানা * হাইজ্যাক * আই লাভ ইউ, ম্যান * সাগর কন্যা পালাবে কোথায় * টার্গেট নাইন * বিষ নিঃশ্বাস * প্রেতাত্মা * বন্দী গগল * জিম্মি তুষার যাত্রা * স্বর্ণ সংকট * সন্ন্যাসিনী * পাশের কামরা * নিরাপদ কারাগার * স্বর্ণরাজ্য, উদ্ধার * হামলা * প্রতিশোধ * মেজর রাহাত * লেনিনগ্রাদ * অ্যামবুশ * আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর * নকল রানা * রিপোর্টার * মরুযাত্রা * বন্ধু * সংকেত * স্পর্ধা * চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ * চারিদিকে শত্রু * অগ্নিপুরুষ * অন্ধকারে চিতা * মরণ কামড় * মরণ খেলা অপহরণ * আবার সেই দুঃস্বপ্ন * বিপর্যয় * শান্তিদূত * শ্বেত সন্ত্রাস * ছদ্মবেশী * কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন * সময়সীমা মধ্যরাত * আবার উ সেন * বুমেরাং * কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ * কুচক্র * চাই সাম্রাজ্য * অনুপ্রবেশ * যাত্রা অশুভ * জুয়াড়ী * কালো টাকা কোকেন সম্রাট * বিষকন্যা * সত্যবাবা * যাত্রীরা হুঁশিয়ার * অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯ * অশান্ত সাগর * শ্বাপদ সংকুল * দংশন * প্রলয় সঙ্কেত * ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ * ডাবল এজেন্ট * আমি সোহানা * অগ্নিশপথ * জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান * গুপ্তঘাতক * নরপিশাচ * শত্রুবিভীষণ * অন্ধ শিকারী * দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ * কালো ছায়া * নকল বিজ্ঞানী * বড় ক্ষুধা * স্বর্ণদ্বীপ * রক্তপিপাসা * অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন * নীল দংশন * সাউদিয়া ১০৩ * কালপুরুষ * নীল বজ্র * মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট * অমানিশা * সবাই চলে গেছে * অনন্ত যাত্রা * রক্তচোষা * কালো ফাইল মাফিয়া * হীরকসম্রাট * সাত রাজার ধন * শেষ চাল * বিগব্যাঙ * অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ * মহাপ্রলয় * যুদ্ধবাজ * প্রিন্সেস হিয়া * মৃত্যুফাঁদ * শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা * মায়ান ট্রেজার * ঝড়ের পূর্বাভাস * আক্রান্ত দূতাবাস * জন্মভূমি দুর্গম গিরি * মরণযাত্রা * মাদকচক্র * শকুনের ছায়া * তুরুপের তাস * কালসাপ গুডবাই, রানা * সীমা লঙ্ঘন * রুদ্রঝড় * কান্তার মরু * কর্কটের বিষ * বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর * নরকের ঠিকানা * অগ্নিবাণ * কুহেলি রাত * বিষাক্ত থাবা * জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

বিসিআই হেড অফিস, ঢাকা।

নিজের অফিসরুমের জানালা দিয়ে বাইরের অবিশ্বাস্য দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে আছে মাসুদ রানা। দু'চোখ ঈষৎ বিস্ফারিত, ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে। বাংলাদেশের এই চেহারা আগে কখনও দেখেনি ও। শুধু ও কেন, কেউ দেখেনি।

ঝিরঝির বৃষ্টির মত তুষার পড়ছে ঢাকায়। রাস্তা ঢাকা পড়ে গেছে। বাড়িঘরের কার্নিসেও তুষার জমেছে। রাস্তাঘাট ফাঁকা, পথচারী একজনকেও চোখে পড়ছে না। অথচ এখন দুপুর, অফিস-আদালত সব খোলা, তারপরও মতিঝিল জনশূন্য। খাঁ-খাঁ করছে ফুটপাথ, রাস্তা।

হ্যারিস টুইডের কোটের কলার তুলে রেখেছে রানা, দুই ল্যাপেল কষে টেনে নিজেকে আলিঙ্গন করে আছে, তবু শীত মানছে না। পিছিয়ে এসে ডেস্কের কাছে দাঁড়াল ও, দৈনিকগুলোর প্রথম পৃষ্ঠার হেডিং আর ছবিগুলোর ওপর চোখ বোলাল—শুধু মৃত্যুর খবর আর লাশের ছবি। গত তিনদিনে ঢাকায় তিনশো মানুষ মরেছে শীতে। গোটা শহর জমে গেছে প্রচণ্ড শীতে। অথচ শহর এলাকার বাইরে সব স্বাভাবিক, কোথাও তুষারের চিহ্নমাত্র নেই।

এ এক অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় চেহারা ঢাকার। ঘর ছেড়ে বাইরে আসতে পারছে না মানুষ। লেপ-কম্বল, কাঁথা মুড়ি দিয়ে দরজা

জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে আছে। ছিন্নমূল বস্তিবাসীর অবস্থা খুবই শোচনীয়। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের অবস্থাও প্রায় এক। শহরে থাকলে মরতে হবে, তাই দলে দলে পালাচ্ছে মানুষ। দুই দিনে জনসংখ্যা অর্ধেকেরও বেশি কমে গেছে ঢাকার।

অথচ সবে চৈত্রের দ্বিতীয় সপ্তাহ শুরু হয়েছে। এ সময়ে ঢাকা ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাঁস করে। এরকম সময়ে শীত কল্পনাও করতে পারে না ঢাকাবাসী।

প্রকৃতির এই উদ্ভট আচরণ কেন? গত তিনদিন ধরে আর সবার মত মাসুদ রানার মনেও বারবার আসছে প্রশ্নটা। শুধু ঢাকাতেই নয়, নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চল ম্যানহাটানে, লন্ডনের প্রাণকেন্দ্রে এবং সৌদী আরবের রাজধানী রিয়াদে সমানে তুষারপাত হচ্ছে গত তিনদিন ধরে। ওই তিন জায়গার তুলনায় ঢাকায় বরং কিছুটা কমই পড়ছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এই চার জায়গায় একই সময়ে শুরু হয়েছে এই অদ্ভুত কাণ্ড। প্রচণ্ড ঝড়, তারপর কনকনে বাতাসের সাথে সোনামুখী সুঁইয়ের মত সরু ফোঁটার বৃষ্টি দিয়ে শুরু ব্যাপারটার। একটানা ছয় ঘণ্টা বর্ষণের পর তুষারে পরিণত হয়েছে পানি। সেই থেকে ঝরছে তো ঝরছেই। এক মুহূর্তের জন্যে থামেনি গত তিনদিনে।

কেন? আবার ভাবল ও। কি কারণ আছে এর পিছনে?

পরদিনই জবাবটা পাওয়া গেল। শুধু রানাই নয়, বিশ্বের সবাই জানল এর নেপথ্য কাহিনী। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারল না কেউ।

এ অবস্থা কোন মানুষের তৈরি, তাই কি বিশ্বাস করা যায়?

চতুর্থ দিনও বিকেল পর্যন্ত চলল টানা তুষারপাত, মৃতের সংখ্যা তখন বাংলাদেশে চারশোয় উঠেছে। সন্ধের একটু আগে হঠাৎ করে থেমে গেল তুষারপাত। একই সাথে সবখানে। খুব দ্রুত পরিষ্কার হয়ে গেল আকাশ, ঢাকার তাপমাত্রা এক লাফে

উঠে গেল একুশে। দলে দলে পথে নেমে এল মানুষ। সবাই হতভম্ব। খুশি হবে কি হবে না, বুঝে উঠতে পারছে না।

এর একটু পর, রেডিওর এক ঘোষণায় চমকে উঠল দুনিয়ার মানুষ। বিশ্বের প্রতিটা দেশে রেডিওর স্বাভাবিক অনুষ্ঠান হঠাৎ করে থেমে গেল, তার পরিবর্তে শোনা গেল একটা ভরাট কণ্ঠস্বর। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, ফ্রেঞ্চ, আরবী, ল্যাটিন, স্প্যানিশ, জার্মান, রুশ এবং চীনা ভাষাসহ মোট পনেরোটা ভাষায় প্রচার হলো রেকর্ড করা ভাষণ। সেটা এরকম:

বিশ্ববাসী, আমি এক পাগল বিজ্ঞানী। মন দিয়ে শুনুন। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার অবিশ্বাস্য এক প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছি আমি। তার কাজের কিছু নমুনা আজ নিয়ে চারদিন আমেরিকা, ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ এবং সৌদি আরব দেখেছে। এর ফলে কত মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তা সংশ্লিষ্ট দেশই ভাল বলতে পারবে। এখন আমি জানাব এই প্রযুক্তির সাহায্যে কি ঘটানো সম্ভব।

বিশ্বের যে কোন প্রান্তে, যে কোন দেশ, যে কোন শহরের ওপর বিশেষ এক রেডিও ওয়েভের সাহায্যে যখন-তখন অদৃশ্য তুষারের পাহাড় সৃষ্টি করতে পারি আমি। ইচ্ছেমত ওটার আকার ছোট-বড় করতে পারি। চোখে দেখা যাবে না, কিন্তু জায়গামতই থাকবে, সময়মত কাজও ঠিকই করবে। যেমন করেছে গত চারদিন। ওগুলো ছিল ছোট পাহাড়, মিনিটে মাত্র দশ লক্ষ ঘনফুট তুষার বর্ষণের ক্ষমতাসম্পন্ন। তারই ফলে গত চারদিনে ওই শহরগুলোর কি অবস্থা হয়েছে, বিশ্ববাসীকে সে সম্পর্কে ভালমত খোঁজ-খবর নিতে অনুরোধ করছি আমি।

ইচ্ছে করলে ওই পাহাড়ের আকার একশো গুণ বড় করারও ক্ষমতা আছে আমার, তা থেকে তুষারও সেই পরিমাণেই পড়বে। যদি সেরকম বড় ধরনের কিছু ঘটাতে বাধ্য হই আমি, ফলাফল কি হবে, সেটাও অনুমান করে নিতে অনুরোধ করছি আমি

বিশ্ববাসীকে।

প্রশ্ন জাগতে পারে, এ কাজ আমি কেন করছি? জবাব হলো, আমি একজন বিজ্ঞানী। নিত্য নতুন সৃষ্টিতে আগ্রহী। কিন্তু অতীতে কিছু কিছু দেশ, বিশেষ করে বাংলাদেশ, ব্রিটেন ও আমেরিকা, আমার প্রতিটা কাজে পদে পদে বাধা দিয়েছে। তাদের কারণে অনেকবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছি। ফলে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার খাতিরে কয়েক বছর গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছে আমাকে। এই সময়টা অভিনব কিছু আবিষ্কারের কাজেও ব্যয় করেছি আমি।

আমি ঘোষণা দিচ্ছি: সে কাজে একশো ভাগ সফল হয়েছি আমি, এবং তার প্রমাণ রাখতে ফিরে এসেছি ওই তিনটি দেশের জন্যে বিভীষিকা হয়ে। আমার অভিনব আবিষ্কারের সামান্য নমুনা দেখেছেন আপনারা এ ক'দিন। এ কেবল শুরু। তেমন কিছুই দেখাইনি বলতে গেলে। প্রয়োজন হলে দেখাব। কিন্তু ব্যাপারটা সাধারণ বিশ্ববাসীর জন্যে ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দেবে বলে আমি সে পথে যেতে চাই না। কারণ সাধারণ মানুষের ওপর আমার কোন ক্ষোভ নেই। আমি চাই না তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হোক।

অতীতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো আমার সাথে যে অন্যায় আচরণ করেছে, প্রথমেই আমি তার প্রতিশোধ নিতে চাই। কাজটা শেষ হলে বিশ্ববাসীর জন্যে ভাল কিছু করার ইচ্ছেও আছে। আমি শুধু ধ্বংস নয়, সৃষ্টি করতেও জানি। ঈশ্বর বলুন, ভগবান বলুন, আল্লাহ বলুন, তিনিই সে ক্ষমতা দিয়েছেন আমাকে।

ব্রিটেন ও আমেরিকার কাছে আমার কিছু দাবি আছে, সেগুলো যদি মেনে নেয়া হয়, আমি হাত গুটিয়ে নেব। গত ক'দিন যা ঘটেছে, তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। দেশ দুটোর জনসাধারণের প্রতি আমার আবেদন, আমি দাবি পেশ করার সাথে সাথে পথে নেমে পড়ুন। আন্দোলনের মাধ্যমে নিজ নিজ সরকারকে বাধ্য

করুন তা মেনে নিতে। কাজটা আপনাদেরকেই করতে হবে, কারণ এর ওপরই নির্ভর করছে আপনাদের এবং আপনাদের পরিবার-পরিজনের ভাল-মন্দ। এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতা কি পরিণতি বয়ে আনবে, সে কথা ভুলবেন না, প্লীজ।

আমার প্রথম দাবি: ব্রিটেন ও আমেরিকাকে আজ এই মুহূর্ত থেকে পনেরো দিন, অর্থাৎ তিনশো ষাট ঘণ্টা বা একুশ হাজার ছয়শো সেকেন্ডের মধ্যে একশো বিলিয়ন ডলার জরিমানা দিতে হবে আমাকে। নগদ অর্থে। দশ, বিশ, পঞ্চাশ আর একশো ডলারের নোটে হতে হবে তা। জাহাজে করে আটটা গন্তব্যে পাঠাতে হবে টাকাগুলো, আমার লোকের হাতে তুলে দিতে হবে। এ ব্যাপারে তিনদিন পর বিস্তারিত নির্দেশনা দেব আমি।

আমার একান্ত অনুরোধ, কেউ আমার দাবিকে হেসে উড়িয়ে দেবেন না, খাটো করে দেখারও চেষ্টা করবেন না। সে ক্ষেত্রে তার পরিণতির জন্যে আমি দায়ী থাকব না। একই ব্যাপারে বাংলাদেশকেও জরিমানা করা উচিত ছিল, কিন্তু তা করছি না। ওদের সাথে অন্যভাবে বোঝাপড়া করার ইচ্ছে আছে আমার।

দ্বিতীয় দাবি, পনেরো দিনের এই সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ব্রিটেন ও মার্কিন সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। তাদের পদত্যাগের মুহূর্ত থেকে আমার তৈরি এক অস্থায়ী সরকার দেশ দুটির শাসনভার গ্রহণ করবে।

একই সময়ে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী, কসাই এরিয়েল শ্যারনকেও পদত্যাগ করতে হবে। সেখানেও নতুন সরকার গঠন করা হবে, এবং সে সরকার অবিলম্বে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংক্রান্ত আলোচনায় বসবে।

তৃতীয় দাবি, সৌদী আরব ও কুয়েত থেকে তথাকথিত মিত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য ও সাজ-সরঞ্জাম পনেরো দিনের মধ্যে প্রত্যাহার করতে হবে।

বিশ্ববাসীর কাছে আমার আবেদন, প্লীজ, কেউ ভুলেও

আমাকে আন্ডারএস্টিমেট করবেন না। সে-ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় নেমে আসবে আপনাদের ওপর, এমন বিপর্যয়, যা কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারবে না।

কেউ যাতে আমার দাবি উড়িয়ে দেয়ার মত ভুল না করে, কেউ যাতে ভেবে না বসে আমি মিথ্যে বড়াই করছি, সে জন্যে নতুন কয়েকটা শহরের ওপর হালকা তুষারপাতের ব্যবস্থা করেছি আমি। আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় গড়ে দশ ইঞ্চি করে তুষার পড়বে সে সব জায়গায়। এসবের সাথে পুরনো জায়গাগুলোও থাকবে।

নতুন জায়গাগুলো হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের তেলআবিব, জেরুজালেম…। পূর্ব-এশিয়ার ইয়াঙ্গুন, হ্যানয়…। যদি এসব দেশের সরকার নিশ্চিত হতে চান, এখনই আবহাওয়া বিজ্ঞানীসহ প্লেন পাঠিয়ে দিন আকাশে। দু'ঘণ্টা সময় আছে, এর মধ্যে নিশ্চিত হয়ে ফিরতে পারবে তারা। আমার তৈরি পাহাড় কেউ দেখতে পাবে না অবশ্য, তবে ওর মধ্যে দিয়ে প্লেন যেতে পারবে অনায়াসে। তখনই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারবেন বাইরের এবং পাহাড়ের ভেতরের তাপমাত্রায় কতখানি তফাত।

আমার প্রথম দাবির ব্যাপারে নির্দেশনা ছাড়া কোন রিমাইন্ডার আমি দেব না। তবে পরেরগুলোর ব্যাপারে দেব। এখনই নয়, পরে।

বিশ্ববাসী, আমার বক্তব্য আপাতত এখানেই শেষ। ধৈর্য ধরে শোনার জন্যে আপনাদেরকে ধন্যবাদ। যে কোনদিন, যে কোন মুহূর্তে আবার হাজির হব আমি। সবার জন্যে রইল শুভেচ্ছা। বিদায়।

বিশ্বের লক্ষ-কোটি শ্রোতাকে হতচকিত, আতঙ্কিত করে রেখে থেমে গেল ভরাট কণ্ঠস্বরটা।

হুলস্থুল পড়ে গেল বিশ্বজুড়ে। খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের নোটিসে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের মীটিং বসল দেশে দেশে। গোয়েন্দা

সংস্থাগুলোর কর্মকর্তারা ব্যস্ত হয়ে উঠল কিভাবে এমন এক সম্প্রচার ঘটল, কোত্থেকে, তার উৎস খুঁজে বের করতে। ঝাঁকে ঝাঁকে প্লেন উঠল আকাশে।

হারাম হয়ে গেল সবার ঘুম।

দুই

এক সপ্তাহ পর।

বিসিআই প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের মুখোমুখি বসে আছে মাসুদ রানা। কথা নেই কারও মুখে। গভীর চিন্তায় মগ্ন।

বৃদ্ধের ডেস্কের বাঁ দিকে রোগা স্বাস্থ্যের একটা নতুন ফাইল। তার ওপর বড় করে লেখা: ফার্নান্দো কোর্টেজ। তার পাশে আরও বড় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন। ভেতরে মেক্সিকো সিটি বিসিআই এজেন্ট জিয়াউল হকের পাঠানো কিছু টপ সিক্রেট কোডেড মেসেজের অনুবাদ রয়েছে। সপ্তাহ তিনেক ধরে পাঠিয়েছে সে। একদিন আগে ওগুলো রানাকে পড়তে দিয়েছিলেন বৃদ্ধ।

এ মুহূর্তে কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। অন্যমনস্ক। রানাও তাই। যেদিন রেডিওতে অজ্ঞাত বিজ্ঞানীর ভাষণ প্রচার হলো, সেদিন থেকে অদ্ভুত এক চিন্তা সার্বক্ষণিকভাবে পেয়ে বসেছে ওকে। একবার মনে হচ্ছে ওই লোকটাকে চেনে ও, পরক্ষণে মনে হয়, না। ভুল ভাবছে ও। কিন্তু পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারছে না। বারবার একটা মুখ ভেসে

উঠছে চোখের সামনে। শেষবার চ্যানেল আইল্যান্ডসের লয পিয়েরেতে মুখটা দেখেছিল রানা। বেশ কয়েক বছর আগে।

তার সাথে কাল থেকে যোগ হয়েছে কোর্টেজের চিন্তা। দুটোর মধ্যে কোন মিল আছে কি না ভেবে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না ও।

'জিয়াউল হকের ফাইলটা পড়েছ তো?' গমগমে কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন মেজর জেনারেল।

নড়েচড়ে বসল ও। 'জ্বি, স্যার।' প্রথম রিপোর্টটার কথা ভাবল। প্রায় তিন সপ্তাহ আগে ওটা পাঠিয়েছে সে। ওটার বক্তব্য এরকম: মেক্সিকো সিটির গ্র্যান্ড অপেরা হাউসের কাছে গত ...তারিখ সন্ধের সময় একটা গাড়ির নিচে পড়তে পড়তে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে সে। দু'জন ছিল গাড়িতে, চালক ও আরোহী। খুব চেনা মনে হয়েছে তার আরোহীকে, কিন্তু চিনতে পারেনি। বসা অবস্থায় দেখেও মনে হয়েছে মানুষটা বিশালদেহী। প্রায় ছয় ফুটের মত দীর্ঘ, মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া, কাঁচাপাকা চুল। প্রতিভাবানদের মত চেহারা। জানা গেছে, লোকটার নাম ফার্নান্দো কোর্টেজ।

ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হওয়ায় হেড অফিসের অবগতির জন্যে রিপোর্ট করেছে সে।

এর পরে আরও ছয়-সাতটা রিপোর্ট পাঠিয়েছে জিয়াউল হক, প্রতিটাই রহস্যময় কোর্টেজ সম্পর্কে: তাকে হাই ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও পার্টস কিনতে দেখা গেছে...ওয়র সারপ্লাস মার্কেট থেকে অস্ত্রশস্ত্রের বড় এক লট কিনেছে সে... হেভি জেনারেটিং প্রজেক্টের জন্যে খুচরা যন্ত্রপাতি কিনতে দেখা গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সর্বশেষ রিপোর্টে সে লিখেছে: গাড়ির সূত্র ধরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ওটা নিকারাগুয়ায় রেজিস্ট্রিকৃত। ফার্নান্দো কোর্টেজ ওই দেশের নাগরিক। লিয়ন ইউনিভার্সিটির ফিজিক্সের প্রফেসর। কিন্তু সরেজমিন তদন্তে ব্যাপারটা মিথ্যে প্রমাণ হয়েছে। ওই নামে

কোন প্রফেসর নেই লিয়ন ভার্সিটিতে। এ ব্যাপারে আরও খোঁজ-খবর করা হচ্ছে।

'কি বুঝলে?' বলে উঠলেন বৃদ্ধ। 'এইসব রিপোর্টের সাথে কোথাও কোন যোগসূত্র চোখে পড়েছে?'

'পড়েছে, স্যার। লোকটার হাই-ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও পার্টস কেনার কয়েক দিন পরই সেই রেডিও ভাষণ প্রচার হয়।'

মাথা দোলালেন বৃদ্ধ, কিছু বললেন না।

'জিয়া এ ব্যাপারে খুব শিগ্‌গিরই আরও বিস্তারিত জানাবে বলেছিল, স্যার।'

'বলেছিল। কিন্তু...' থেমে গেলেন রাহাত খান।

'কি, স্যার?'

'ও মারা গেছে। মেরে ফেলেছে ওকে ফার্নান্দো কোর্টেজ।'

চমকে উঠল রানা। 'কবে, কখন?'

'চারদিন আগে।'

'কিভাবে...মানে...'

সামনে থেকে একটা টাইপ করা শীট তুলে নিলেন বৃদ্ধ, এগিয়ে দিলেন। 'পড়ো।'

একটা মেসেজ, ছোট। তিনদিন আগের তারিখের। দ্রুত পড়ে ফেলল ও, কিন্তু প্রথমবার কিছুই বুঝল না। তিনবার পড়তে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। সেটা এরকম: গতকাল স্থানীয় সময় সন্ধে সাতটার দিকে গাড়ি নিয়ে কোর্টেজকে অনুসরণ করার সময় পিছন থেকে আরেকটা গাড়ি এসে ধাক্কা মারে জিয়াউল হকের গাড়িকে। ফলে মেক্সিকো-গুয়াতেমালা পাহাড়ী হাইওয়ে থেকে দেড়শো ফুট নিচে পড়ে যায় সে।

এক হাইওয়ে ট্রাক ড্রাইভার দূর থেকে ঘটনা দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। সেখান থেকে ফোন করা হয় লোকাল বিসিআই অফিসে। ওরা এসে পৌঁছার কয়েক মিনিট পর মারা যায় জিয়াউল হক।

শীটটা রেখে মুখ তুলল রানা। হতাশায় চেহারা কালো হয়ে উঠেছে। 'যাহ! তার মানে লিঙ্ক কেটে গেছে?'

'যেত,' মৃদু গলায় বললেন রাহাত খান। 'যদি সহকর্মীরা সময়মত হসপিটালে পৌঁছতে না পারত।'

'অর্থাৎ?'

তখনই জবাব দেয়ার গরজ দেখা গেল না বৃদ্ধের মধ্যে। বেশ সময় নিয়ে পাইপে তামাক ভরলেন তিনি। বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে টিপে বাউলের মধ্যে ভাল করে বসিয়ে নিয়ে ধরালেন। ওর দিকে তাকিয়ে টানতে লাগলেন। প্রশ্নটা আরেকবার করবে কি না ভাবছিল রানা, এমন সময় মুখ খুললেন।

'মারা যাওয়ার আগে সো-কল্ড কোর্টেজের গাড়ির নাম্বারসহ মোটামুটি সমস্ত তথ্যই তাদেরকে জানিয়ে যেতে পেরেছে জিয়াউল হক।'

'তারপর?' ঝুঁকে বসল রানা।

'ওরা সঙ্গে সঙ্গে কোর্টেজের গাড়ির নাম্বার জানিয়ে দেয় আমাদের গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস আর নিকারাগুয়ান সেলকে। দু'দিন পর ওটাকে হন্ডুরাস ও নিকারাগুয়ার মাঝের ফেরি থেকে পিক করে আমাদের এক নিকারাগুয়ান এজেন্ট। পিছু নেয়।'

'গাড়িটা কোথায় গেছে জানতে পেরেছে সে?'

মাথা দোলালেন রাহাত খান। 'নিকারাগুয়ার প্রিনযাপোলকার কাছের মসকুইটো কোস্টে।'

এক মিনিট চুপ করে থাকল ও। তারপর বলল, 'এবার কি, স্যার?'

'তোমার কিছু সন্দেহ হয়?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ। 'সেদিনের রেডিওর সেই কণ্ঠস্বর, কথা বলার ভঙ্গি, তারপর জিয়াউল হকের পাঠানো ফার্নান্দো কোর্টেজের বর্ণনা, এর মধ্যে কোন মিল আছে মনে হয়?'

'হয়, স্যার,' সঙ্গে সঙ্গে বলল রানা। 'কেবল সন্দেহই নয়,

আমি প্রায় নিশ্চিত।'

কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন মেজর জেনারেল, তারপর আস্তে করে মাথা নাড়লেন। 'আশ্চর্য! এতদিন পরে...তোমাকেই যেতে হবে, রানা।'

'আমি যাব, স্যার,' ব্যস্ত কণ্ঠে বলল ও।

মনে হলো শুনতে পাননি বৃদ্ধ। 'পত্রিকায় পড়েছ নিশ্চই ইংল্যান্ড আমেরিকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সুবিধের নয়,' বলে চললেন অন্যমনস্ক কণ্ঠে। 'ডেটলাইন যত এগিয়ে আসছে, ওদের ওখানে ততই উত্তেজনা বাড়ছে। আতঙ্কিত হয়ে উঠতে শুরু করেছে মানুষ। যে কোন সময়ে যা-তা কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। ঘোষণা দিয়ে যেভাবে লোকটা তুষারপাতের প্রদর্শনী দেখিয়েছে, তাতে সেরকম কিছু ঘটলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কাজেই তাড়াতাড়ি এর একটা বিহিত করা জরুরী হয়ে পড়েছে। জিয়াকে মেরে আমাদেরকে রীতিমত চ্যালেঞ্জ করেছে ওই দাম্ভিক বদমাশটা।'

'আমাকে কখন যেতে হবে, স্যার?'

'আজই,' বলে ড্রয়ার থেকে একটা বাদামী রঙের ফাইল বের করলেন রাহাত। 'এরমধ্যে অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আছে। পড়ে ফেলো রুমে গিয়ে। তারপর সোহেলের সাথে দেখা করবে।'

'জ্বি, স্যার,' উঠে পড়ল রানা।

'হাসছিস যে!' চোখ কুঁচকে তাকাল সংস্থার চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদ। মনে হলো এখনই বুঝি কষে এক ধমক দিয়ে বসবে।

'দুঃখে হাসছি, ব্রাদার,' বলল রানা। 'বড় দুঃখে।'

'মানে? কিসের দুঃখ?'

'এই যে, প্রত্যেকবার অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়ার আগে তোর

মত হেজিপেজিকে দিয়ে ব্রিফ করানো হয়, সেই দুঃখে।'

'ও, এই কথা?' গম্ভীর হয়ে উঠল সোহেল। 'তা প্রত্যেকবার যখন একই ব্যাপার ঘটে, তখন তো তোর বুঝে নেয়া উচিত লোকটা হেজিপেজি নয়। যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কেউ।' রেগে উঠল। 'দেখ্, শালা, আমি কোথায় একমাত্র শ্যালকের সাফল্য চেয়ে আল্লার দরবারে মনে মনে কান্নাকাটি করে মরছি, আর ওদিকে তুই এভাবে হেয় করছিস্ আমাকে?'

'কান্নাকাটি করছিস্!' বিস্ময় ফুটল রানার চেহারায়। 'তা আগে বলবি তো! বল্ এবার, আর কি?'

'আর কি মানে? শুরুই তো করতে দিলিনে এখন পর্যন্ত।'

'কর না শুরু, কে নিষেধ করেছে?' গা জ্বালানো বাঁকা হাসি হেসে নড়েচড়ে বসল ও। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাতে যাচ্ছিল, বাধা দিল সোহেল। ভুরু কুঁচকে তাকাল।

'নো স্মোকিং,' বলে বুড়ো আঙুল দিয়ে নিজের পিছনের দেয়ালে সাঁটা বড় একটা কার্টুন স্টিকার দেখাল। ওটায় লেখা: ধূমপান মুক্ত এলাকা। 'কড়াভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'

'কবে থেকে?' বলে যেন এ জগতে নেই, এমনভাবে একটা সিগারেটের ফিল্টার টিপ্ বের করে প্যাকেটটা বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিল রানা। 'দারুণ হয়েছে স্টিকারটা। কার্টুনিস্ট আহ্সান হাবীবের আঁকা মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।' চট্ করে সিগারেটটা তুলে নিল সোহেল।

হাত সরাল না রানা, তেমনি বাড়িয়ে ধরে রাখল। বলল, 'তাহলে তো মুশকিল। দে তাহলে, নিষিদ্ধ যখন...'

'তোর খাতিরে নিষেধাজ্ঞা কিছুক্ষণের জন্যে রিল্যাক্স করা হলো,' বলে সিগারেটটা ধরাল সোহেল। গম্ভীর। 'এবার...'

'এক কাপ কফি খাওয়াবি না?' নরম গলায় বাধা দিল ও। 'প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব কিনা...' থমকে গেল সোহেলের চেহারা দেখে।

ওর ফরসা মুখটা মুহূর্তে কালো, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কাঁপা গলায় বলল, 'ছাই পড়ুক তোর মুখে, শা-লা! এমন অলুক্ষণে কথা আর কখনও মুখে আনলে...তোর...পিটিয়ে তোর নাক-মুখ ভর্তা করে দেব আমি।'

'সরি, দোস্ত,' সোহেলের মনের অবস্থা টের পেয়ে তাড়াতাড়ি বলল ও। 'ভুল হয়ে গেছে।'

'আমার সামনে এরকম ভুল আর কখনও করবি না,' বলল ও। 'তোর মুখ ভাল না। এ ধরনের কথা প্রায়ই খেটে যায়।'

'ঠিক আছে, দোস্ত, আর বলব না। সরি।'

'হ্যাঁ, বলবি না!' হাত বাড়িয়ে ইন্টারকমের সুইচ টিপল সোহেল, কফির অর্ডার দিয়ে সামনের ফাইলে মন দিল। 'রাত ন'টায় ইউ.এস. এয়ারফোর্সের একটা বিশেষ প্লেন আসছে,' ভেতরে খানিক চোখ বুলিয়ে নিয়ে শুরু করল ও, 'তোদেরকে নিয়ে যেতে।'

' "তোদেরকে" মানে?'

মুখ তুলল সোহেল। 'তোকে আর তোর যমজ ভাইকে।'

'বুঝলাম না,' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার।

'পরে বলছি, আগে ফার্স্ট রাউন্ড শেষ করতে দে। প্রথমে নিউ ইয়র্ক যাচ্ছিস তোরা, ওখান থেকে আলাদা হয়ে দু'জন দু'দিকে।'

'নিউ ইয়র্কে কেন?'

'এ মুহূর্তে মেক্সিকোর কাছাকাছি প্রশান্ত মহাসাগরে আছে মার্কিন সপ্তম নৌ-বহর,' সোহেল বলল। 'নিউ ইয়র্ক থেকে সেটায় গিয়ে চড়তে হবে তোকে।'

'একা?' ঝুঁকে বসল রানা। 'যমজ ভাই যাচ্ছে না?'

মাথা নাড়ল চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। 'ও যাচ্ছে নিকারাগুয়ার রাজধানীতে। তোর "ডাবল" হিসেবে। তোর আগেই রওনা হয়ে যাবে সে।'

'তারপর? সপ্তম নৌ-বহর থেকে?'

'নিকারাগুয়ার প্রিনযাপোলকায় তো কয়েকবারই গিয়েছিস তুই।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ওর কাছেই, মসকুইটো কোস্টে।'

'বুঝেছি।'

'প্রিনযাপোলকায় তোর জন্যে একজন স্ট্যান্ড বাই এজেন্ট থাকবে আমাদের,' সোহেল বলল। 'দশ নম্বর ক্যাল্লে মন্টেনিগ্রোয় ডক্টর ফার্নান্দেজের নার্স হিসেবে।'

'কে?'

'সেটা বলা যাবে না। ওখানে গিয়ে জেনে নিতে হবে তোকে।'

'বেশ। তাকে স্ট্যান্ড বাই রাখা হচ্ছে কেন?' বলল রানা।

'মিশন শেষ করে প্রিনযাপোলকায় যেতে হবে তোকে। সেখান থেকে ও তোকে নিয়ে কেটে পড়বে। এ মুহূর্তে মেক্সিকোয় আছে সে।'

'আমাকে নিয়ে কেটে পড়ার জন্যে আরেকজনকে কেন দরকার পড়ল?' বিরক্তি ফুটল রানার চেহারায়। 'একাজে কবে কার সাহায্য প্রয়োজন হয়েছে আমার?'

'আসলে সমস্যা সেটা নয়, দোস্ত,' সোহেল নড়েচড়ে বসল। 'সমস্যা হচ্ছে ওই এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা। তুই তো ভালই জানিস সে কথা। কাজ শেষ হলে কুইক রিট্রিটের প্রয়োজন পড়বে তোর, কিন্তু দেখা যাবে সময়মত প্রয়োজনীয় ট্রান্সপোর্টেশন ব্যবস্থা...'

'বুঝলাম,' বাধা দিল রানা। 'সে ক্ষেত্রে এই এজেন্টটি আমাকে কিভাবে সাহায্য করবে?'

'ও একজন পাইলট।'

'সে কে, আই মীন, ছেলে না মেয়ে?'

ভুরু কোঁচকাল সোহেল। 'মেয়ে।' একটু বিরতি। 'কি হলো,

দাঁত কেলাচ্ছিস যে বড়?'

'না, এমনি,' শ্রাগ করল রানা।

' "মেয়ে" শুনেই খুশিতে আটখানা, কেমন?' দাঁত খিঁচাল সোহেল। 'শা-লা! কি যে মুসিবতে আছি তোকে নিয়ে। "মেয়ে" শুনলেই...'

ব্রেক কষল ও পি.এ. মেয়েটিকে কফি নিয়ে ঢুকতে দেখে। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে যার যার কাপ তুলে নিল রানা-সোহেল।

'দ্বিতীয় রাউন্ড কখন শুরু হচ্ছে?' কফি শেষ করে প্রশ্ন করল রানা।

জবাবে আবার ইন্টারকমের সুইচ টিপল সোহেল। বলল, 'মাসুদ রানাকে আসতে বলো।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'ও মাসুদ রানা? তাহলে আমি কে?'

'তুই?' সোজা হয়ে বসল সোহেল। 'বলছি।'

দরজা খোলার শব্দে ঘুরে তাকাল রানা। ওর চোখে চোখ রেখে ভেতরে এসে দাঁড়াল যুবক, মুখে মৃদু হাসি। ওর চেয়ে দুই-এক বছরের ছোটই হবে সে, অনুমান করল রানা। কাঁধ ওর মত প্রশস্ত নয়, একটু সরু। নইলে অবিকল ওরই প্রতিচ্ছবি। এমনকি হাঁটার ভঙ্গিটাও একদম ওরই মত।

'এ মাল কোত্থেকে জোগাড় করলি?' দ্রুত, চাপা গলায় প্রশ্ন করল ও।

'জিঞ্জিরা,' একইভাবে জবাব দিল সোহেল। আগন্তুকের উদ্দেশে বলল। 'এসো, বোসো।'

রানার পাশের চেয়ারটা খালি রেখে তার পাশেরটায় বসল যুবক। ঘন ঘন তাকাচ্ছে ওর দিকে। চেহারায় প্রচণ্ড কৌতূহল।

'পরিচয় করিয়ে দিই,' সোহেল বলল। হাত তুলে আগন্তুককে দেখাল। 'এ মাসুদ রানা। আর এ,' রানাকে দেখাল, 'মিগুয়েল কার্থেজ।'

ওখানেই বিষয়টার ইতি টানল সোহেল, আর কিছু বলল না। রানাও কোন প্রশ্ন করল না। জানে, বুড়োর মাথায় নিশ্চয়ই কোন অভিনব প্ল্যান গজিয়েছে, যার জন্যে একই মিশনে 'দুই মাসুদ রানার' প্রয়োজন পড়েছে। একজনের সাথে অন্যজনের কাজের কোন সংশ্রব নেই, কাজেই ভেতরের সবকিছু না জানলেও কিছু আসবে-যাবে না।

পাঁচ মিনিট পর বিদেয় নিল যুবক। তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল সোহেল। ফিরে এসে রানা ওরফে কাথের জর দায়িত্ব সম্পর্কে ভাল করে বুঝিয়ে দিল ওকে। 'ব্যস,' বলা শেষ হতে হেলান দিয়ে বসল। 'এই পর্যন্তই। বাকি সব তোর ওপর নির্ভর করছে।'

মাথা দোলাল রানা। গম্ভীর, চিন্তিত। ফাইল এক পাশে সরিয়ে রেখে আরেক দফা কফির অর্ডার দিল সোহেল। ও-ও গম্ভীর, চিন্তিত। প্রায় নীরবেই কফি শেষ করল ওরা, সিগারেট ধরিয়ে নীরবে টানতে লাগল।

'কি ভাবছিস্?' মৃদু গলায় প্রশ্ন করল সোহেল।

'লয় পিয়েরের কথা ভাবছি,' বলল রানা। 'অতবড় বিস্ফোরণের মধ্যে থেকেও কোন মানুষ বেঁচে যেতে পারে, এখনও বিশ্বাস হয় না আমার।'

'কিন্তু না করেও তো উপায় নেই, দোস্ত। সেই কণ্ঠ, সেই কথা বলার ভঙ্গি, সেই হামবড়া ভাব,' মাথা এপাশ ওপাশ নাড়ল সোহেল। 'সব মিলে যাচ্ছে। আর কী অভিনব আবিষ্কার! সত্যিই নতুন দুঃস্বপ্ন হয়ে ফিরে এসেছে শয়তানটা।'

আরও মিনিট দশেক পর উঠল রানা। ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল সোহেল। হ্যান্ডশেক করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল রানা, কিন্তু সোহেল সেটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এক হাতে ওকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল।

'কাজ শেষ করে সুস্থ দেহে ফিরে আসতে হবে তোকে, মনে

রাখিস্,' বলল ও। 'এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

ওর চেহারায় উদ্বেগ দেখে মৃদু হাসল রানা। কুর্নিশের ভঙ্গি করে বলল, 'জো হুকুম, জাহাঁপনা।'

তিন

মসকুইটো কোস্ট। চারদিন পরের কথা।

টুংলা নদীর সামান্য উত্তরে বিশাল এলাকা জুড়ে প্রায় দুর্ভেদ্য গভীর এক বন। তার মাঝখানে বেশ খানিকটা খোলামেলা জায়গা। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক হাজার বছরের পুরানো এক মায়ান মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এসব অবশ্য ইতিহাসের কথা। এখন সুরক্ষিত এক দুর্গ সে মন্দির।

বর্তমানে ওটাকে কেন্দ্র করে এলাহি কারবার চলছে। মন্দিরের সরাসরি নিচে, গভীর তলদেশে গড়ে তোলা হয়েছে অত্যাধুনিক এক ল্যাব-কাম-রেসিডেন্স। সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবস্থাসহ সব ধরনের আধুনিক সুযোগ সুবিধে আছে সেখানে। সমস্ত কার্যক্রম কম্পিউটারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মন্দিরের চারদিকের মাটিতে সব সময় মৃদু কাঁপুনি অনুভূত হয়। নিচের প্রচণ্ড ক্ষমতাধর জেনারেটরের কারণে ঘটে ব্যাপারটা।

মন্দিরটা বাইরে থেকে দেখতে পিরামিডের মত। নিচ থেকে দেখলে মনে হবে ওটা ঝোপঝাড় ও বুনো লতাপাতায় ঢাকা, কিন্তু ওপরের দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। উঠানের মত বড় এক পাকা চত্বর আছে ওখানে। হেলিপ্যাড হিসেবে ব্যবহার হয়। একটা গার্ড

হাটও আছে। দু'জন করে সশস্ত্র গার্ড চব্বিশ ঘণ্টা টহলের ওপর থাকে সেখানে।

এ মুহূর্তে মন্দিরের অভ্যন্তরে জরুরী বৈঠক চলছে। তাতে সভাপতিত্ব করছে মন্দির কেন্দ্রিক যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হোতা ফার্নান্দো কোর্টেজ। জেনারেটরের গুঞ্জন ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই নিচে। নীরব, নিস্তব্ধ।

দীর্ঘদেহী মানুষ কোর্টেজ। বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশি। দেহের তুলনায় মাথাটা বড়। মাথা ভর্তি কাঁচাপাকা, ঝাঁকড়া চুল। এলোমেলো। খাড়া নাক। বড় বড় চোখ। দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। সব মিলিয়ে প্রতিভাবানদের মত চেহারা, লক্ষজনের মাঝেও খুব সহজেই সনাক্ত করা যায় তাকে। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। রাশভারী প্রকৃতির মানুষ। তাকে দেখলেই ভয়ে বুক কাঁপে কর্মচারীদের।

নিজের প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পিছনে সুইভেল চেয়ারে বসে আছে সে। সামনে প্রায় অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার ডান হাত, টোচেল। মেসতিজো ইন্ডিয়ান লোকটা। ঝাড়া ছয় ফুট দীর্ঘ। মুখটা সরু, বাজপাখির ঠোঁটের মত বাঁকা নাক। কপাল ঠেলে বেরিয়ে আছে খানিকটা। ফলে মনে হয় দু'চোখ গর্তে বসা। চাউনি সাপের মত, হাসি কখনও চোখ পর্যন্ত পৌঁছায় না তার।

সব মিলিয়ে ভীতিকর একটা চেহারা। কোর্টেজের বেতনভুক আড়াইশো নির্দয়, খুনে মেসতিজোর চীফ সে। তার ভয়ে সারাক্ষণ তটস্থ থাকে সবাই, সেই টোচেল তটস্থ থাকে ফার্নান্দো কোর্টেজের ভয়ে। লোকটাকে যমের চেয়েও বেশি ভয় তার। অথচ মজার কথা হচ্ছে; গত দু'বছর ধরে তার ডানহাত হিসেবে আছে সে, এর মধ্যে তার সাথে দুর্ব্যবহার তো পরের কথা, কখনও সামান্য চড়া গলায়ও কথা বলেনি কোর্টেজ। তারপরও কেন লোকটাকে তার এত ভয়, সে নিজেও জানে না।

নতমুখে টেবিলে তাল ঠুকছিল কোর্টেজ, হঠাৎ মুখ তুলে

টোচেলের দিকে তাকাল। বিশুদ্ধ স্প্যানিশে বলল, 'যা যা বলেছি করা হয়েছে?'

'সি, সেনিয়র,' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল সে। 'মেক্সিকো সিটি থেকে গ্রিনযাপোলকা পর্যন্ত প্রত্যেকটা ল্যান্ডিং স্পটে চারজন করে লোক আছে আমাদের। সবার কাছে আপনার সেই লোকের ছবি আছে। দেখা দেয়ামাত্র ফলো করা হবে তাকে।'

'সবাইকে বলে দিয়েছ তো লোকটাকে সুস্থ দেহে চাই আমি?'

'সি, সি! প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা টোকাও কেউ দেবে না তার গায়ে। ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছি প্রত্যেককে।'

'গুড!' মাথা দোলাল ফার্নান্দো কোর্টেজ। 'গুড! তবে একটা কথা মনের মধ্যে খুব ভাল করে গেঁথে নাও, টোচেল। ওই লোক খুবই বিপজ্জনক। সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনক। একবার যদি বিপদ আঁচ করতে পারে, তাহলে ওর নাগাল পাবে না তুমি।'

'লোকটা কে, সেনিয়র?' বিনয়ের সাথে জানতে চাইল টোচেল।

'ও এক দেশপ্রেমিক স্পাই,' বলল কোর্টেজ। 'নাম মাসুদ রানা।'

'তার সাথে আপনার কিসের শত্রুতা?'

হাসি ফুটল কোর্টেজের মুখে। 'ও আইনের লোক, আর আমি...সে যাক। অতীতে বহুবার লোকটার মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু,' তর্জনী দিয়ে ডান ভুরু চুলকে নিল সে। 'কোনবারই সুবিধে করে উঠতে পারিনি আমি। প্রত্যেকবারই লোকটা প্রচণ্ড ক্ষতি করেছে আমার। এবার তার শোধ তুলে নিতে চাই আমি।'

বিস্ময়াহত চেহারায় তার দিকে তাকিয়ে থাকল মেসতিজো ইন্ডিয়ান। 'আপনার ক্ষতি করেছে!' কোনমতে বলল। 'এই লোক?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল কোর্টেজ। 'এবারও আসবে ও, আমি

জানি। আসবেই। রেডিও ভাষণে নিজের নাম গোপন করে গেলেও এমন কিছু কথা আমি বলেছি, যাতে অনেকের মত ওরও জানতে বাকি নেই আমি কে। তাছাড়া মেক্সিকোয় ক'দিন আগে যাকে তুমি হত্যা করেছ, সে মাসুদ রানারই সহকর্মীদের একজন। কাজেই ও আসবে। যদি না আসে, তাহলেই বরং অবাক হব আমি।'

তাজ্জব হয়ে বসের দিকে তাকিয়ে থাকল টোচেল। কথাগুলো বিশ্বাস করবে কি না ভেবে পাচ্ছে না।

'ভাল কথা,মন্দিরের চারদিকে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেয়ার কথা ছিল, তার কতদূর?'

চোখের সাথে সামঞ্জস্যহীন কঠিন হাসি ফুটল টোচেলের মুখে। 'প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর গোটা দশেক ট্র্যাপ সেট করা বাকি আছে। আজকের মধ্যেই সেরে ফেলব ওগুলো।'

'কতগুলো বসানো হয়েছে?' জানতে চাইল কোর্টেজ।

'এখন পর্যন্ত ত্রিশটার মত, সেনিয়র।'

'মত?' চেহারা বিগড়ে গেল কোর্টেজের।

'না, সেনিয়র!' ঘাবড়ে গিয়ে হড়বড় করে উঠল লোকটা। 'ত্রিশটাই সেট করা হয়েছে।'

'বিকেলে আমি নিজে গিয়ে চেক করব সব ক'টা।'

'অবশ্যই! ততক্ষণে বাকি দশটাও সেট করা হয়ে যাবে।' খানিক উসখুস করল লোকটা, তারপর বলল, 'কিন্তু, সেনিয়র, একদিকে আপনি মাসুদ রানাকে সুস্থ দেহে পেতে চাইছেন, অন্যদিকে আবার তার জন্যে বোমার ফাঁদ পেতে রাখতেও বলছেন। যদি...' বসের মুখে হাসি দেখে ব্রেক কষল সে। 'সেনিয়র!'

'তুমি ভেবেছ ফাঁদ পেতে মাসুদ রানাকে জখম বা হত্যা করতে চাইছি আমি?' বলল কোর্টেজ। 'না। তেমন কিছু চাইছি না আমি। আর আমি চাইলেও সেরকম কিছু ঘটার কোন সম্ভাবনাই

নেই। লোকটা যদি আসে, ফাঁদ কেন, কিছুই ঠেকাতে পারবে না ওকে।'

'তাহলে ওগুলো বসিয়ে কি লাভ?' বেকুবের মত চেহারা হলো টোচেলের। কোথাকার কোন এক মাসুদ রানা সম্পর্কে বস্ এত সমীহ করে কথা বলছে, বিশ্বাসই হতে চাইছে না তার।

যদি তার ওয়াচারদের চোখ কোনমতে ফাঁকি দিয়ে কমান্ডো বাহিনী নিয়ে এসেই পড়ে রানা, বা কোন ইঙ্গ-মার্কিন দল, কোর্টেজের ধারণা, দলে অন্তত আটজন থাকবে তাহলে। তাদের মধ্যে কেউ না কেউ অবশ্যই ভুল করবে, একটা না একটা ফাঁদ অজান্তে মাড়িয়ে বসবে। ফলে সে হয় মরবে, নয়তো আহত হবে। কিন্তু কোর্টেজের আসল উদ্দেশ্য সেটা নয়। বিস্ফোরণ ঘটলে বনে লুকিয়ে রাখা তার 'সাউন্ড রিসিভার' আওয়াজ রিসিভ করে মন্দিরের ভেতরের মেইন কম্পিউটারকে সঙ্গে সঙ্গে জানান দেবে। ওটাই তার উদ্দেশ্য।

তেমন কিছু ঘটলে সতর্ক হয়ে উঠতে পারবে কোর্টেজ, তৎক্ষণাৎ হুমকি কার্যকর করে সরে পড়বে জায়গা ছেড়ে।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল সে। শুনে হাসল টোচেল। 'বুঝেছি, সেনিয়র। তবে আমাদের চোখ এড়িয়ে মাসুদ রানা তো দূরের কথা, অন্য কেউ মন্দিরের ধারেকাছেও আসতে পারবে না।'

'তবু সাবধানতার প্রয়োজন আছে। আমি চাই না...' টেলিফোনের শব্দে থেমে গেল ফার্নান্দো কোর্টেজ। টোচেলের মোবাইল ফোন বাজছে। দ্রুত ওটা কানে লাগাল ইন্ডিয়ান। 'হ্যালো!'

কয়েক মুহূর্ত ও প্রান্তের বক্তব্য শুনল লোকটা, তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, 'ঠিক দেখেছ তো? কোন ভুল হয়নি তো তোমার?...আচ্ছা?...হ্যাঁ, লাইনে থাকো।' বসের দিকে তাকাল। 'সেনিয়র! মাসুদ রানা মানাগুয়া পৌঁছেছে একটু আগে।'

'হোয়াট!' স্প্যানিশ ভুলে ইংরেজিতে বলে উঠল কোর্টেজ। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার।

'সি, সেনিয়র। একটু আগে ইউ.এস. এয়ার ফোর্সের ফাইটারে মানাগুয়া পৌঁছেছে,' সেটটা এগিয়ে ধরল সে। 'কথা বলবেন?'

ওটা প্রায় কেড়ে নিল কোর্টেজ, কানে লাগিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল, 'হ্যালো!'

প্রায় দশ মিনিট কথা বলল সে কলারের সাথে। যতটুকু সময় শুনল, তার দ্বিগুণ সময় নানান নির্দেশ দিল লোকটাকে। তারপর সেট রেখে হাসতে শুরু করল। ক্রমে তা অট্টহাসিতে পরিণত হলো। তার ভরাট গলার হাসিতে গমগম করে উঠল রুম, কিছুক্ষণের জন্যে থেমে গেল যেন জেনারেটরের সার্বক্ষণিক গুঞ্জন। হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল টোচেল।

হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে পড়ল কোর্টেজের। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে চোখ মুছল সে। তারপর বিশুদ্ধ বাংলায় বলে উঠল, 'এসো, মাসুদ রানা। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষায় আছি।'

ভাষাটা বুঝতে না পেরে বিমূঢ় চেহারা হলো টোচেলের। 'সেনিয়র!' ঝুঁকে এল সে। 'কিছু বলছেন?'

'অ্যাঁ? না, তোমাকে নয়, টোচেল। তুমি যেতে পারো এখন। আর হ্যাঁ, নতুন ফাঁদ পাতার দরকার নেই আর। যা আছে তাই যথেষ্ট।'

'সি, সেনিয়র,' মোবাইল ফোন সেটটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল মেসতিজো।

দিনের বাকি সময়টা প্রসন্ন, ফুরফুরে মেজাজে কাটাল ফার্নান্দো কোর্টেজ। ওর মধ্যেও কিছু একটা ঘটার প্রতীক্ষায় ছিল সে। কিন্তু ঘটল না। পরদিনও ঘটল না ব্যাপারটা, এমনকি তার পরদিনও না। ক্রমে গম্ভীর, চিন্তিত হয়ে উঠতে লাগল সে। চতুর্থ

দিন মুখ না খুলে পারল না।

'নাহ্, মানাচ্ছে না।'

'কিসের কথা বলছেন, সেনিয়র?' টোচেল প্রশ্ন করল।

'মাসুদ রানার আচরণ!' রাগ রাগ গলায় বলল সে। তার সাথে কিছুটা হতাশাও আছে। 'তিনদিন হলো মানাগুয়ায় এসে বসে আছে। রাজ্যের শপিং আর মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে, এ কি আশ্চর্য ব্যাপার!'

'এতে আশ্চর্যের কি আছে, সেনিয়র?'

'যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না,' গম্ভীর গলায় বলল কোর্টেজ। 'মিশনে এসে মাসুদ রানা শপিং করবে, মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করবে, হতেই পারে না। এ অসম্ভব! এ অসম্ভব! এর মধ্যে নিশ্চই গভীর কোন ষড়যন্ত্র আছে। ওরা…ওরা আমাকে অসতর্ক, অপ্রস্তুত করে তুলতে চাইছে?'

মাথা দোলাল সে অন্যমনস্ক চেহারায়। 'হতে পারে। হতে পারে। দাঁড়াও! তোমাদের জন্যেও একটা চমক রেডি করছি আমি। টোচেল, ইনস্টলেশন-ইন-চার্জদের এখনই খবর দাও। বলবে, কাল বিকেলের মধ্যে সবাইকে এখানে হাজির চাই আমি। আমাদের প্ল্যানে কিছু পরিবর্তন ঘটাতে যাচ্ছি এখন। ওদের সেসব জেনে রাখা দরকার!'

'সি।'

'এখনই যোগাযোগ করো সবার সাথে। আমি কিছু জরুরী কাজ করব এখন, কেউ যেন ডিসটার্ব না করে।'

'সি, সেনিয়র!'

'দাঁড়াও, আরও আছে। বাকি ফাঁদগুলো যত তাড়াতাড়ি হয় সেট করে ফেলো। আর আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আধঘণ্টা পর পর মানাগুয়ার সাথে কথা বলবে। মাসুদ রানার আচরণে কোন পরিবর্তন দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে। বোঝা গেছে?'

'সি, সি!'

'যাও।'

সেদিন সারাদিনই নিজের ল্যাবে একা কাটাল প্রফেসর কোর্টেজ। ট্রান্সমিটিং সিস্টেমে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন ঘটাল। কাজ শেষ হতে অদৃশ্য কাউকে উদ্দেশ করে বুড়ো আঙুল দেখাল। 'এসো এবার। দেখি তোমাদের দৌড় কত।'

কাজ শেষ করে যখন বের হলো সে, তখন গভীর রাত। ল্যাবের দরজার সামনেই এক চেয়ারে বসে ঢুলছিল টোচেল, বসের সাড়া পেয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল।

'কাজ কমপ্লিট?' প্রশ্ন করল কোর্টেজ।

'কমপ্লিট, সেনিয়র।'

জানে নেই, তবু বলল, 'মানাগুয়ার নতুন কোন খবর আছে?'

'না, সেনিয়র। নেই।'

'ঠিক আছে, তুমি এখন বিশ্রাম নাও গিয়ে। এখন আর চিন্তার কিছু নেই। সব পাকা করে ফেলেছি।'

কি পাকা করা হয়েছে, জানার কৌতূহল জাগল টোচেলের। কিন্তু জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না।

গালফ অভ মেক্সিকো। গভীর রাত।

সপ্তম নৌ বহরের ডেস্ট্রয়ার মেরিল্যান্ডের আফটার ডেকে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা ওরফে মিগুয়েল কার্থেজ। যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়ে কমান্ডারের সাথে কফি খাচ্ছে শেষবারের মত। ওর পিঠে বড়সড় একটা ব্যাকপ্যাক।

কফি শেষ হতে পেপার কাপটা দলা করে সাগরে ছুঁড়ে মারল রানা। ঘড়ি দেখল—একটা পঁয়ত্রিশ। সিগারেট ধরাল ও কমান্ডারকে অফার করে। 'সময় হয়ে গেছে,' বলল মৃদু গলায়।

ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে মাথা দোলাল কমান্ডার। 'রাইট।' কাপ ফেলে দিয়ে বলল, 'জাস্ট আ মিনিট।'

ব্যস্ত পায়ে ফোরডেকের দিকে চলে গেল সে। মিগুয়েল কার্থেজ কে, জানে না লোকটা। বহরের কমান্ডার-ইন-চীফ কেন তার ঘাড়ে লোকটাকে গোপনে নিকারাগুয়ার মসকুইটো কোস্টে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব চাপিয়েছে, তাও না। জানতে চায়ও না সে। অর্ডার ইজ অর্ডার। তাই পালন করে চলেছে সে মুখ বুজে। অবশ্য এসবে যে সে একেবারেই অনভিজ্ঞ, তাও নয়। মানুষটা নিশ্চয়ই কোন বিপজ্জনক মিশনে চলেছে, তা ঠিকই বুঝেছে।

মিনিট দুয়েক পর একটা আউট বোর্ড এঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন শুনতে পেল রানা, তার পরপরই ফিরে এল কমান্ডার। 'আসুন, এদিক দিয়ে।'

তাকে অনুসরণ করে ডেস্ট্রয়ারের পোর্ট সাইডে ঝোলানো এক দড়ির মইয়ের কাছে এসে দাঁড়াল ও। মইটার গোড়ার দিক থেকে আসছে আওয়াজটা। উঁকি দিয়ে কালোর মধ্যে গাঢ় কালো একটা আকৃতি দেখতে পেল ও। ডেস্ট্রয়ার এ মুহূর্তে অনড়। এঞ্জিন বন্ধ, সমস্ত আলোও অফ করে রাখা হয়েছে। ওদিকে আকাশে চাঁদও নেই, ডুবে গেছে। ফলে চারদিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ও।

'বেস্ট অভ লাক, মিস্টার কার্থেজ,' হাত বাড়িয়ে দিল কমান্ডার। ওর হাত মুঠোয় নিয়ে ঝাঁকিয়ে দিল।

'থ্যাঙ্কস ফর এভরিথিং,' রানা বলল। ব্যাকপ্যাকটা ঠিকমত বসিয়ে নিয়ে এক ক্রুর সাহায্যে পা রাখল মইয়ে, সাবধানে নামতে শুরু করল। নিচে পৌঁছতে দু'জোড়া কঠিন হাত ধরে ডেকে দাঁড় করিয়ে দিল ওকে।

এক মিনিটের মধ্যে ডেস্ট্রয়ারের গা থেকে সরে এল রানার বাহন, নাক উঁচু করে ছুটতে শুরু করল আঁধারের বুক চিরে।

চার

মাথার ওপর দৈত্যাকার ছাতার মত গাছের ছাউনি, নিচে ঘন ঝোপ, স্যাঁতসেঁতে মাটি। পাতার ছাউনি ভেদ করে এখান-সেখান থেকে উঁকি দিচ্ছে সূর্যের আলো, সার্চ লাইটের মত নেমে এসে মাটি ছুঁয়েছে। তাতে আঁধার দূর হয়নি, বরং আধিভৌতিক এক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

চারদিক ধোঁয়াটে, ভ্যাপসা গরম। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে মাসুদ রানার। নীরবে ওর প্রাণশক্তি শুষে নিচ্ছে নিকারাগুয়ার মসকুইটো কোস্ট নামের এই দুর্ভেদ্য জঙ্গল। মসকুইটো ইন্ডিয়ানদের নামে নাম রাখা হয়েছে এটার। এর আরেক নাম নিকারাগুয়ান হেল্।

এখন দুপুর। আগের গোটা দিন এবং আজ এতক্ষণ, এই জাহান্নামে কেটেছে রানার। আরও কতক্ষণ কাটবে ঠিক নেই। কিন্তু ধৈর্য টলে গেছে ওর, আর পারছে না। এত ক্লান্ত ও, ইচ্ছে করছে শুয়ে পড়তে। ওকে ঘিরে রাখা গাছপালা, ঝোপঝাড়, ভেজা মাটিও একই পরামর্শ দিচ্ছে—শুয়ে পড়ো। আর কত? আত্মসমর্পণ করো। বাকি কাজ পোকামাকড়েরা সেরে ফেলবে।

কিন্তু সবকিছু অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলেছে ও। কারণ সন্ধের আগেই জায়গামত পৌঁছতে হবে। না পৌঁছলে চলবে না। ঝোপঝাড়ের বাধার কারণে এমনিতেই পিছিয়ে পড়েছে ও, আর দেরি করার উপায় নেই। কিন্তু গতি যে বাড়াবে, সে সাধ্যও নেই।

এক পা এগোচ্ছে ও, বড়সড় একটা তীক্ষ্ণধার ম্যাচেটির

কোপে সামনের বাধা সাফ করে আরেক পা ফেলছে। এ পর্যন্ত এরকম কয়েক হাজার কোপ মারতে হয়েছে। সমস্যা এড়ানোর জন্যে দু'হাতে কাজ করেছে রানা, ফলে দুই হাতেরই আঙুল থেকে কাঁধ পর্যন্ত ব্যথায় টন্‌টন্ করছে। হাতের সাথে সমানে মুখ চলছে, অনবরত খিস্তি করে চলেছে ও। কারণ সহজে দূর হতে চাইছে না পথের বাধা। মনে হচ্ছে কাটা পড়েও ঝোপগুলো যেন আবার লাফ মেরে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

দরদর করে ঘামছে ও। পরনের কাপড় ভিজে লেপ্‌টে আছে গায়ের সাথে। প্যাক হার্নেসও।

গতকাল খুব সকালে ইউ.এস. নেভির এক পিকেট বোট লাগুনা ডি পের্লাসের কাছে নামিয়ে দিয়ে গেছে ওকে। ওখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ওর গন্তব্যের উদ্দেশে একটানা হাঁটছে রানা। টুংলা নদীর মোটামুটি সমান্তরাল রেখা ধরে।

রানা যেখানে পৌঁছতে চায়, সেখানে যাওয়ার কোন পথ নেই। একটা রাস্তা যা আছে, প্যান আমেরিকান হাইওয়ে, সেটা এ তল্লাটের উল্টোদিকে। ন্যাশনাল রেলরোড অবশ্য আছে, কিন্তু সে পথে আসায় ঝুঁকি ছিল। ট্রেন ছেড়ে স্থানীয়দের ট্রেইল ধরে এগোতে হত, সে ক্ষেত্রে রহস্যময় কোর্টেজের লোকজনের চোখে পড়ার চান্স ছিল ষোলো আনা। কারণ এটা কোন ট্যুরিস্ট রিজিয়ন নয়, বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া কোন বিদেশীর এদিকে আসার কারণ নেই কোন।

নিচু চুড়োওয়ালা এক পর্বতশ্রেণীর পুব মালভূমি বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। এটার সর্বোচ্চ চুড়ো ছয় হাজার ফুটও নয়, সবচেয়ে ছোটটার উচ্চতা দু'হাজারের মত। পশ্চিমদিকে আছে খাড়া ঢাল। উর্বর প্লেইন ও লেক আছে ওদিকে।

এদিকের ঢালে রয়েছে পরগাছায় আবৃত গভীর জঙ্গল। যার আদি নেই, অন্তও নেই। বনের মধ্যে আছে দুর্ভেদ্য ঝোপঝাড় এবং মাশরুম। বিষাক্ত পোকামাকড়ের ডাক আর ভ্যাপসা, অসহ্য

দুর্গন্ধ। সময় যত গড়াচ্ছে, তত খাড়া হয়ে উঠছে ওর চলার পথ। রিজ তীক্ষ্ণ হচ্ছে, গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে গিরিসঙ্কট। ওপরে জমে থাকা বৃষ্টির পানি অনবরত গড়াচ্ছে কুল্ কুল্ শব্দে। ব্যাঙ ডাকছে।

চারদিকে এতকিছুর একটানা বিচিত্র কলগুঞ্জন শুনতে শুনতে পাগল হওয়ার দশা রানার। তারওপর ডালে সাপ, মাটিতে সাপ, বিছা। মুহূর্তের জন্যে অসতর্ক হলেই যন্ত্রণাময় মৃত্যু। দুপুরে খাওয়ার সময় হতে মিনিট দশেকের জন্যে থেমেছিল, এছাড়া টানা এগিয়েছে রানা। তবু দেরি হয়ে গেছে, প্রায় নিশ্চিত জানে।

কিন্তু ধারণায় ভুল ছিল, সন্ধের কিছু আগে ব্যাপারটা টের পেয়ে খুশি হয়ে উঠল রানা। কিছুটা সামনে প্রায় মসৃণ, দীর্ঘ কাণ্ডের কাহুন গাছের আরেক দুর্ভেদ্য বন দেখে গতি কমাল। পালকের মত পাতা কাহুনের। কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সর্বত্র আছে এই গাছ। তবে এখানকার মত এত ঘন খুব কমই আছে।

এতে প্রমাণ হয় এ অঞ্চলে অতীতে আবাদ হত। কাহুন থেকে তেল উৎপাদন করত মায়ানরা। বাসাও বাঁধত এই গাছে। এত ঘন কাহুন গাছ এখানে, দেখে বিস্মিত না হয়ে পারল না রানা। রীতিমত দুর্ভেদ্য দেয়ালের মত।

ওগুলোর জন্যে গতি এমনিতেই কমে গিয়েছিল, আরও কমিয়ে দিল ও। কারণ ফার্নান্দো কোর্টেজের হেডকোয়ার্টার্স যে সামনেই কোথাও, তথ্যটা জানা আছে। বিসিআইয়ের স্থানীয় এজেন্ট খুঁজে বের করেছে জায়গাটা।

চার হাত-পায়ে এগোতে শুরু করল এবার রানা, একচুল এগোবার আগে নিজের চারদিকের প্রতি ইঞ্চি মাটি তন্নতন্ন করে দেখে নিচ্ছে। কারণ এর মধ্যে তিনবার মরতে মরতে বেঁচে গেছে ও। সারা জঙ্গলে মাইন পেতে রাখা হয়েছে।

বেজির মত সন্তর্পণে, সাপের মত এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে ঝোপ

ও বোল্ডারের মধ্যে দিয়ে। ঘামছে দরদর করে। প্যাকের ভারে মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে যাওয়ার দশা। বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ডানে-বাঁয়ে দুলছে ওটা। চোখে ঘাম পড়ে একটু পরপরই ঝাপ্সা করে তুলছে দৃষ্টি। শার্টের আস্তিনে চোখ মুছছে রানা, ঘনঘন।

এটা যদি মাইন ফিল্ড অতিক্রম করার প্র্যাকটিস হত, সমস্যা ছিল না। কিন্তু তা নয় এটা। এখানে সামান্যতম ভুল হলেই জীবন দিয়ে মাসুল গুনতে হবে। তাই কোথাও বাঁকা হয়ে থাকা ঘাসের ডগা, পায়ের চাপে চেপ্টে যাওয়া শ্যাওলা, বা অনড় পোকামাকড় আছে কি না, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হচ্ছে ওকে। অল্প সময়ের মধ্যে পরপর কয়েকটা মাইন আবিষ্কার করল রানা, পাশ কাটিয়ে এল সাবধানে। তার কেটে ওগুলোকে অকেজো করতে যাওয়া হত আত্মহত্যার নামান্তর।

ট্রেইলে পৌঁছার খানিক আগে একটা ফ্লেয়ারের ট্রিপ ওয়্যার চোখে পড়ল। সাবধানে ওটার কাছে পৌঁছতে মাটিতে পোঁতা একটা 'ভেরি' সিগন্যাল কার্ট্রিজ দেখতে পেল ও। ওটাকে ডিজআর্ম করল। ট্রেইলটা আসলে আগাছায় ঢাকা একটা ট্র্যাক, টুংলা নদীর দিক থেকে এসে উত্তরে চলে গেছে। ওটার মাথায় একটা ডক আছে, টুংলার তীরে সম্ভবত কোর্টেজের কিছু আউটপারও আছে, ট্র্যাকের দুপাশের ঝোপের আড়ালে।

ভেবেচিন্তে ট্র্যাক এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিল রানা। নিজের ঘাঁটির কাছের এক ট্র্যাক নিশ্চয়ই অরক্ষিত রাখেনি লোকটা। কষ্ট অগ্রাহ্য করে ঝোপ কেটে কেটেই এগোল ও। গজ ত্রিশেক এগিয়ে দেখল হঠাৎ করে বেঁকে গেছে পথ। যেখানে বাঁক খেয়েছে, সেখানে একটা গর্ত। শ্যাওলা সেঁটে আছে গর্তের মুখে। সূর্যের আলোয় ভেতরের কিছু অংশ দেখা যায়। ওটা একটা শ্যাফট ফাঁদ!

শ্যাফটের দুদিকে তারের ফেন্স দিয়ে বেশ খানিকটা জায়গা ঘেরা, যাওয়ার উপায় নেই রানার। ডিঙিয়ে যাওয়া যেত, কিন্তু

ইচ্ছে করেই গেল না। ওর সন্দেহ ওটা সাধারণ কোন ফেন্স নয়। মানুষের দেহের তাপমাত্রা বা আর কিছু সনাক্ত করার ক্ষমতা আছে হয়তো ওটার। জাল এড়াতে হলে বেশ খানিকটা পিছিয়ে যেতে হবে এখন রানাকে। তাই করবে? নাকি...

কিন্তু তাতে দেরি হয়ে যাবে। সন্ধে ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছে, যে কোন মুহূর্তে পুরোপুরি আঁধার হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে কিছুই করার থাকবে না ওর। একচুলও এগোতে পারবে না। ভেবেচিন্তে না পিছাবার সিদ্ধান্ত নিল ও, খুব সাবধানে দু'আঙুলে শ্যাওলার ঝুলে থাকা পর্দাটা তুলল। ফাঁদই।

সিঙ্গল-ফায়ারিং প্রেশার ফিউজ। লম্বা করে দম নিল রানা, ভেজাহাতের তালু প্যান্টের সাথে ডলে ফিউজের মাথা মুচড়ে দিল। রিমে জঙ ধরে গেছে। প্যাঁচ খুলতে চায় না। ধৈর্যের সাথে, বেশ সময় নিয়ে ওটাও খুলল। রিম তুলে ভেতরের ফিউজ পাউডার বের করে নিল রানা, রিম জায়গামত বসিয়ে শ্যাওলার পর্দা আস্তে করে ছেড়ে দিয়ে সশব্দে দম ছাড়ল।

একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার চলতে শুরু করল, যথাসম্ভব সন্তর্পণে। বাকি পথ পাড়ি দিতে আরও একটা মাইন ও কয়েকটা ফ্লেয়ারের ব্যবস্থা করতে হলো ওকে। অবশেষে অপেক্ষাকৃত এক খোলা জায়গায় এসে পড়ল। বিশ-পঁচিশ গজ সামনে ছোটখাট পাহাড়ের মত এক ঢিপি দেখে তাকিয়ে থাকল। পরগাছায় আবৃত গাছ আর ঘন ঝোপে প্রায় ঢাকা ওটার চারদিক।

পিরামিডের মত দেখতে ওটা। পিরামিডের মতই নিপুণ হাতে পাথরের ওপর পাথর বসিয়ে তৈরি। একদিকে কয়েকশো সিঁড়ির ধাপ, চুড়ো পর্যন্ত উঠে গেছে। সিঁড়ির মাথায় পাথরের দেয়াল, গোল হয়ে ঘিরে রেখেছে চুড়ো। উজ্জ্বল রঙের নানান ফুল আর বাহারি লতাপাতায় ঢাকা।

কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন এক মায়ান টেম্পলের ধ্বংসাবশেষ ওটা জানা আছে মাসুদ রানার। অতীত শান শওকত

আর জৌলুসের ছিটেফোঁটাও নেই ওটার কোথাও, আছে শুধু কালের করাল থাবার ছাপ। প্রাণহীন, গম্ভীর। নিঃসঙ্গ।

ওই টেম্পলের ঐতিহাসিক মূল্য বা গুরুত্ব নিয়ে একটুও মাথা ঘামাল না রানা। অন্য বিষয়ে ঘামাচ্ছে। ওদের স্থানীয় সেলের তথ্য যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমানে ওটাই ফার্নান্দো কোর্টেজের হেডকোয়ার্টার্স। ওখানে বসে বিশ্বকে মুঠোয় পোরার স্বপ্ন দেখছে উন্মাদ কোর্টেজ।

তাকে ঠেকাতেই হবে। যে করে হোক।

পাঁচ

কাঁধ থেকে ব্যাকপ্যাক নামাল রানা। আপাতত এটার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, সাথে নেয়ার ইচ্ছে নেই। পরে আবার কাজে লাগবে, যদি ও ফিরে আসতে পারে। ওটা থেকে ছোট একটা ইউটিলিটি কেস বের করল। দেখে যাই মনে হোক, কেসটার ভেতরে আছে বিসিআইয়ের এক্সপার্টদের তৈরি অন্য কিছু। কেসটা কোমরের বেল্টের সাথে ক্লিপ দিয়ে আটকে নিল রানা। এছাড়া সঙ্গে আছে চার ইঞ্চি ব্লেডের একটা স্টিলেটো এবং ওর প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথার পিপিকে। ম্যাচেটিটা সঙ্গে নেবে কি না ভাবল রানা। পথে বনের মত ঘন ঝোপ নেই যে কেটে সাফ করে এগোতে হবে ওকে, তাছাড়া টেম্পলের ভেতরে যদি লড়তে হয়, তখন ম্যাচেটি বিশেষ কাজে আসবে না। তখন প্রয়োজন পড়বে আগ্নেয়াস্ত্রের। কাজেই ওটাও রেখে দিল।

তারপর ধীরেসুস্থে এগোল সামনের দিকে। ও প্রায় নিশ্চিত, পিরামিডের চারদিকে প্রচুর মাইক্রোফোন পাতা আছে মানুষের বা পশু-পাখির আনাগোনার শব্দ ধারণ করার জন্যে। তাই লঘু পায়ে এগোচ্ছে, যাতে ব্যাটারা ওকে পরের দুটোর একটা ছাড়া আর কিছু ভেবে না বসে। সিঁড়ির দিকে গেল না রানা, উল্টো দিক দিয়ে বেরিয়ে থাকা শেকড়, বুনো আঙুরের লতা, গাছের গুঁড়ি ইত্যাদি ধরে ধরে উঠতে শুরু করল।

গন্তব্যে এসে পড়েছে, এই চিন্তায় মুহূর্তের জন্যে বেখেয়াল হয়ে উঠেছিল, তাই বিপদটা দেখতে পেল একেবারে শেষ মুহূর্তে। সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠে ব্রেক কষল ও। জমে গেল জায়গায়। মাইন ট্রিগার! কাছাকাছি দুই গাছের সাথে একটু উঁচুতে বাঁধা হলদেটে, সুতোর মত আঙুরের লতা ওটা। রানা আর দু'ইঞ্চি এগোলেই টান পড়ত। পিছনে তাকাল ও। পাঁচ হাত দূরের একটা গাছে ওর কাঁধ বরাবর উঁচুতে বাঁধা আছে মাইনটা। ছোট, তবে ওকে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট শক্তিশালী।

ঘুরে অন্যদিক দিয়ে এগোল রানা, এবার আরও অনেকগুণ সতর্কতার সাথে। থেমে থেমে, কান খাড়া।

সন্ধে নামল, কালো ভেলভেটের মত ঢেকে ফেলল চারদিক। মাথার ওপরের গাছপালার ফাঁক দিয়ে চাঁদ দেখতে পেল ও। সরু চাঁদ, কাত হয়ে বাঁকা হাসি হাসছে যেন।

পিরামিডের চুড়োয় উঠে এল ও, পাথুরে দেয়ালের বড়সড় এক ফাঁকে নিজেকে গুঁজে দিয়ে চারদিকে তাকাল। প্রথমেই ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা একটা কপ্টারের ওপর চোখ পড়ল। পিরামিডের সমতল ছাদে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। পিরামিডের ছাদটা টেবিলটপের মত সমতল, চারকোনা। সারফেস পরিষ্কার। দেখে মনে হয় ইদানীং কোন নির্মাণ কাজ হয়েছে এখানে। ছাদের অন্য পাশে কুঁড়েঘরের মত একটা ঘর।

টেম্পলে ঢোকার অন্য কোন পথ না দেখে সেদিকেই যাবে

ঠিক করল রানা। ওর ধারণা ওটার ভেতরেই আছে প্রবেশপথ। কিন্তু এখনই সেদিকে যাওয়ার উপায় নেই, কারণ দুই সশস্ত্র গার্ড আছে সামনে। একজন যান্ত্রিক ফড়িংটার গায়ে হেলান দিয়ে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, অন্যজন চারদিকে চক্কর মারছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ওকে পাশ কাটাবে সে।

লোক দুটো খাটো, গাট্টাগোট্টা মেসতিজো—অর্ধেক স্থানীয় ইন্ডিয়ান, অর্ধেক স্প্যানিশ। নিকারাগুয়ার জনসংখ্যার সত্তর ভাগই মেসতিজো। ঢিলা ধূসর প্যান্ট, ঢিলা শার্ট পরে আছে তারা। পায়ে নরম সুয়েড বুট। ওসব দেখলে ব্যাটাদের গার্ড বলে মনে হয় না, মনে হয় দুই নিপাট ভদ্রলোক হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। অবশ্য তাদের কাঁধে ঝোলানো লাইট অটোম্যাটিক রাইফেল দুটো অন্য কথা বলে। ওগুলো বেলজিয়ামের তৈরি ৭.৬২ এম এম ন্যাটো এফএএল—অন্যতম সেরা রাইফেল এবং ল্যাটিন আমেরিকানদের সবচেয়ে পছন্দের অস্ত্র।

হেলিকপ্টারটা বেল হাইয়ক্স ১৩ আর। দেখতে ঠিক ঘাস ফড়িঙের মত ওটা। সরু লেজ একটু উঁচু হয়ে থাকে পিছনদিকে। নির্ভরযোগ্য যন্ত্র। কোর্টেজের মালপত্র যে এটায় করেই এই বাজপড়া জায়গায় আসে, বুঝতে দেরি হলো না ওর। সে জন্যেই এই সমতল ছাদ তৈরি করা হয়েছে।

ওসব ছেড়ে বর্তমান সমস্যা নিয়ে ভাবল রানা। অনেক কাছে এসে পড়েছে গার্ডটা। জটিল পরিস্থিতি। লোক দুটোর মাঝের ব্যবধান এত বেশি যে একসাথে দুজনের ব্যবস্থা করার কোন উপায় নেই। একজনকে ঠাণ্ডা করতে গেলে অন্যজন সতর্ক হয়ে যাবে। তবু এক সাথে, একই আঘাতে কি করে দুটোকেই অচল করা যায়, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল।

এসে পড়ল গার্ড, অলস পায়ে ওর পিছন দিয়ে ঘুরে চলে গেল পথে পড়ে থাকা কিছু ছোট-বড় পাথরের টুকরোর মধ্যে দিয়ে। প্যারাপেটের ওপর দিয়ে বাইরে নজর বোলাচ্ছে বটে, কিন্তু কিছু

দেখছে বলে মনে হয় না। রাইফেল কাঁধে ঝুলছে। ভুলেও একবার পিছনে তাকাচ্ছে না, এতই বিরক্তিকর, একঘেয়ে লাগছে ব্যাটার।

এসব ক্ষেত্রে বেসিক রুল হচ্ছে—নিজের চারদিকে কি ঘটছে জানার চেষ্টা করা। তাতে প্রাণ হারাবার ঝুঁকি থাকে না। নইলে ফল হয় উল্টো।

ওয়ালথারের নলে নিঃশব্দে সাইলেন্সার পরাল রানা। ওটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে স্টিলেটোটা বের করল। দুটোই প্রস্তুত। পাথরের সাথে মিশে পাথর হয়ে আছে ও। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে সামনে। সাঁঝের অন্ধকারে বিভ্রান্ত হয় চোখ, কাজেই খুব সতর্ক না থাকলে সমস্যায় পড়তে হবে।

আবার এগিয়ে আসছে গার্ড, দম বন্ধ করে অপেক্ষায় আছে রানা। আচমকা উধাও হয়ে গেল লোকটা। পথে পড়ে থাকা পাথরের জন্যে কোথায় কোথায় দিক বদলাতে হয়, সব তার মুখস্থ। পাথর এড়াতেই দিক বদলেছে সে, কিন্তু রানা ভাবল ওকে বুঝি দেখে ফেলেছে। গা ঢাকা দিয়েছে আত্মরক্ষার জন্যে। ব্যস্ত হয়ে ভাবছে কি করবে, তখনই চোখের কোণ দিয়ে একজোড়া পা দেখতে পেল ও। এসে পড়েছে লোকটা। এত কাছ দিয়ে গেল যে তার শ্বাস নেয়ার ও কাপড়ের খস্‌খস্ স্পষ্ট শুনতে পেল রানা।

ঝাঁপ দিল সময় হয়েছে বুঝে। ওর একটা চোখ রয়েছে কম্প্টারের সাথে হেলান দিয়ে থাকা গার্ডের ওপর, কাছেরটাকে তার বিরুদ্ধে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করার ইচ্ছে। কারণ সবদিক থেকে সে-ই ওর জন্যে আসল হুমকি। লাফিয়ে উঠেই লোকটাকে সই করে পর পর দুটো গুলি করল রানা। দুটোই বুকে খেল সে, সোজা হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পেল না, ভাঙাচোরা পুতুলের মত বসে পড়ল ওখানেই। কোন আওয়াজও করল না।

একই মুহূর্তে স্টিলেটো ধরা হাতও চালিয়েছে রানা। ওর ধারণা ছিল সঙ্গীর অবিশ্বাস্য পরিণতি দেখে মুহূর্তের তরে হলেও

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে কাছের গার্ড, সেই সুযোগে তার হৃৎপিণ্ডে ওটা সেঁধিয়ে দেবে। কিন্তু উল্টে ওকেই হতভম্ব করে চোখের পলকে একপা পিছিয়ে গেল লোকটা, বসে পড়ল ঝপ্ করে। পরের কয়েক সেকেন্ডের ঘটনা সারাজীবনের জন্যে ঝাপ্‌সা স্মৃতি হয়ে থাকবে রানার মনে।

উপযুক্ত ট্রেনিং পাওয়া যে কেউ এরকম জরুরী মুহূর্তে কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হত, কিন্তু এ লোক তা না করে বরং কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওটা ফেলে দিল। একই মুহূর্তে কোমরে বাঁধা খাপ্ থেকে একটা ইনফ্যান্ট্রি ছোরা বের করে নিল ঝট্ করে। ওদিকে রাইফেলটা রানার ছুরি ধরা হাতের ওপর পড়ায় ঝাঁকিতে ওটা পড়ে গেল মুঠো থেকে।

ওয়ালথার ধরা হাত দ্রুত ঘোরাল রানা, তখনও ধোঁয়া বের হচ্ছে ওটার নল থেকে। বাম হাত তুলে এক ক্লাসিক্যাল ব্লক সৃষ্টি করে ওকে ঠেকিয়ে দিল গার্ড, ডান হাতে ধরা দশ ইঞ্চি ব্লেডের ছোরাট চালাল ওর পেট সই করে। বাঁ পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে সরে গেল রানা, বাঁ হাতে লোকটার ছোরা ধরা ডান হাতের কব্জি ধরে জোরে এক মোচড় দিয়ে হাতটা তার পিছনে নিয়ে এল, আটকে ফেলল হ্যামার লকে।

বিপদ টের পেয়ে চিৎকার করার জন্যে হাঁ করল গার্ড, সঙ্গে সঙ্গে ওয়ালথারের নলটা তার মুখে ঢুকিয়ে দিল ও। ছাড়া পাওয়ার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করল গার্ড, গোঙাচ্ছে বিকট গোঁ-গোঁ শব্দে। তার ডান হাত ওপরদিকে ঠেলে দিল রানা, কাঁধের হাড়ে বেমক্কা চাপ পড়ায় সামনে ঝুঁকে দাঁড়াতে বাধ্য হলো লোকটা। কিন্তু হাল ছাড়ল না, দুই গোড়ালি দিয়ে পিছনদিকে লাথি ছুঁড়ছে ঘনঘন।

মুখের মধ্যে পোরা পিস্তলটা ছেড়ে দিয়ে ডান হাতে লোকটার নাকচোখ পেঁচিয়ে ধরল রানা পিছন থেকে। ব্যাপার টের পেয়ে থেমে গেল লোকটা—আত্মসমর্পণ করছে যেন। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। এক ঝট্‌কায় তার ঘাড় ভেঙে দিল ও। পিস্তল বের করে

নিয়ে দেহটা ছেড়ে দিল। ধড়াস করে আছড়ে পড়ল ওটা। ঘাড়টা বেকায়দা ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে আছে। কিন্তু সেসব দেখার সময় নেই রানার, এক দৌড়ে গিয়ে ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ঢুকেই সরু একসার কাঠের সিঁড়ি দেখতে পেল, প্রায় খাড়া নেমে গেছে। বহু ব্যবহারে ক্ষয়ে পাতলা হয়ে গেছে ধাপ। মায়ান সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগের স্মৃতি বহন করছে ওগুলো। ভারী স্যাপোডিলা কাঠের ক্রস বীম দেখতে পেল রানা। তাতে চমৎকার নকশা খোদাই করা। ওগুলোয় বয়সের ছাপ পড়েনি একটুও। আগ্নেয় শিলার তৈরি দেয়াল, বিচিত্র রঙের আঁকিবুকি আছে তাতে। সিলিঙের বৈদ্যুতিক আলোয় এখনও সে রং জ্বলজ্বল করছে।

সিঁড়ির মাঝামাঝি পর্যন্ত নেমে ইতস্তত করতে লাগল ও, কিন্তু ওপর বা নিচ, কোনদিক থেকেই কারও সাড়া পাওয়া গেল না। একটু অপেক্ষা করে আবার নামতে শুরু করল। অনেকক্ষণ পর নিচের ল্যান্ডিঙে পৌঁছে দাঁড়াল। ল্যান্ডিঙের ওপরে উঁচু, প্রশস্ত এক খিলান। বাঁ দিকে একটা দীর্ঘ করিডর। খিলানের ওপাশের সবকিছু নতুন তৈরি—কংক্রীট, স্টীলের গার্ডার ও অ্যালুমিনিয়ামের।

সিলিঙে বৈদ্যুতিক আলোর দীর্ঘ সারি, তার সমান্তরালে চলে গেছে লম্বা শীট মেটালের ফ্লু। ওটায় কয়েক গজ পর পর ডাক্ট আছে, ঠাণ্ডা বাতাস আসছে ওগুলো দিয়ে। আধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

করিডরের অন্য মাথায় ব্যাঙ্কের ভল্টের মত ভারী এক স্টীলের দরজা। কোন হাতল নেই ওটায়। আছে ফ্লাশ-মাউন্টেড লক। পাশের কেসমেন্টের সাথে সেট করা লাল রঙের বড় এক বাটন আছে। ওটা টিপলে হয়তো খোলে গেটটা। কিন্তু রানার সন্দেহ হলো বাটনটা কলিং বেল ধরনের কিছুও হতে পারে। টিপলে কেউ এসে ভেতর থেকে খুলে দেয়।

ঠাণ্ডা, ধাতব দরজায় কান পাতল ও। জেনারেটরের গুঞ্জন ছাড়া কিছুই শুনতে পেল না। পুরু দরজা ভেদ করে কানে আসছে দূরাগত, শক্তিশালী জেনারেটরের গুঞ্জন। দরজার তালাটা তীক্ষ্ণ চোখে পরখ করল ও, তারপর ইউটিলিটি কেস থেকে বের করল একটা লক-এইড।

ছোট, স্প্রিং চালিত গ্যাজেট ওটা। তালার মধ্যে সরু, নির্দিষ্ট প্রান্ত ভরে দিলে অসংখ্য নিড়ল তালার টাম্বলারে অনবরত আঘাত করতে থাকে ওটা না খোলা পর্যন্ত। অবশ্য ওই জিনিসের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে যথেষ্ট প্র্যাকটিস ও ধৈর্যেরও প্রয়োজন হয়। তিনবারের চেষ্টায় সফল হলো রানা, আপনা থেকেই খুলে গেল দরজা। ভেতরে কেউ ওকে অভ্যর্থনা জানাতে দাঁড়িয়ে নেই দেখে হাঁপ ছাড়ল ও, দ্রুত ভেতরে ঢুকে লাগিয়ে দিল দরজা।

সামনে আরেক প্রস্থ সিঁড়ি। সময় নষ্ট না করে বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে নামতে শুরু করল। যত নামছে, ততই জোরাল হচ্ছে জেনারেটরের গুঞ্জন। এছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ভেতরে মানুষজন আছে বলে মনে হয় না। নেমে চলেছে রানা, ওর জুতোর ফাঁপা শব্দ আর ছায়া অনুসরণ করছে ওকে। ওদিকে গুঞ্জনও বাড়ছে জেনারেটরের, সেই সাথে মাটির কাঁপুনি।

সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে আরেকটা করিডর দেখতে পেল ও, তারপর আরও এক প্রস্থ সিঁড়ি এবং আবারও করিডর। সবশেষে আরেকটা ভল্টের মত দরজা। গুঞ্জন ওই দরজার ওপাশ থেকেই আসছে। লক-এইডের সাহায্যে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা।

নিচু সিলিঙের একটা বড় রুম এটা, কয়েক সারি টিউব লাইট জ্বলছে ভেতরে। ওর দু'পাশের পুরো দেয়াল জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেকগুলো লম্বা লম্বা ধাতব কেবিনেট। ওগুলোর সারা গায়ে অসংখ্য মিটার, ডায়াল, ডাটা-প্রসেসিং রীলের গ্লাস-এনকেসড ডেক ইত্যাদি দেখতে পেল রানা। রুমের মাঝখানে প্রায় পনেরো ফুট লম্বা একটা সুইচ বোর্ড, ওটারও সারা দেহ লীড, নব আর

কন্ট্রোলে বোঝাই। ওসবের একেকটার নিচে লেখা একেক ধরনের সাইন: ল্যাবিয়ন ইনডেক্স, রিভার্স ইন্ডাকশন এফিশিয়েন্সি বা ক্যাথারিডিন ফ্যাক্টর ইত্যাদি। একটারও অর্থ বুঝল না রানা।

এই অবিশ্বাস্য বৈদ্যুতিক কেরামতির ইনপুট এসেছে রানার উরুর সমান মোটা এক কেব্‌ল্ থেকে। মেঝেতে পাইথনের মত এঁকেবেঁকে পড়ে আছে ওটা। রুমের ও-মাথার দেয়ালের সাথে যুক্ত। তার পাশেই আরেকটা দরজা, জেনারেটর ওই দরজার ওপাশেই।

ওদিকে গেল না রানা, সোজা কম্পিউটার ব্যাঙ্কের দিকে এগোল। ঝট্‌পট্ খুলে ফেলল কয়েকটার সার্কিট প্যানেল। সহজে সার্ভিসিঙের জন্যে জুড়ে রাখা চেইনের সাথে কাত হয়ে ঝুলে থাকল ওগুলো। ভেতরে চক্‌চক্ করছে অজস্র ট্রানজিস্টর, ফিল্ড-ইফেক্ট সার্কিট ও ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট। এবার ইউটিলিটি কেস থেকে একটা চ্যাপ্টা প্রেশারাইজড্ পলিয়েস্টার ফ্লাস্ক বের করল ও।

জিনিসটা দেখতে পোকামাকড় মারার স্প্রে ক্যানের মত। ভেতরে আছে কম্পিউটারের বারোটা বাজাবার মশলা—স্বচ্ছ করোডিং অ্যাসিড। প্রত্যেকটা কম্পিউটারের ভেতরে খানিকটা করে অ্যাসিড ঢালল রানা, তারপর দ্রুত হাতে লাগিয়ে দিল প্যানেলগুলো। এটাই ছিল কেসের আসল মাল।

বোমা ফাটিয়ে এসবের হয়তো অর্ধেক উড়িয়ে দিতে পারত রানা, কিন্তু তাতে ওর মিশন সম্পূর্ণ হত না। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু যন্ত্রপাতি অক্ষত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাও হয়তো পারা যেত, তেমন শক্তিশালী বোমার আঘাতে গোটা টেম্পল উড়িয়ে দিয়ে। কিন্তু মাটির নিচে কিছু থাকলে তাতেও কাজ হত না।

তাই একাজে অ্যাসিডই বেছে নেয়া হয়েছে। ফেরার পথে রানা যদি ধরাও পড়ে যায়, ভেতরের ব্যাপার কোর্টেজ টের পাওয়ার আগেই ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে যাবে। খুব যত্নের সাথে

কাজটা শেষ করল রানা। কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে ওর উদ্দেশ্য সফল হতে। ভেতরে সবকিছু পুড়িয়ে কম্পিউটারগুলোকে স্রেফ খোলসে পরিণত করবে করোডিং অ্যাসিড।

প্রথম রাউন্ড শেষ হতে কম্পিউটার ব্যাঙ্ক থেকে সরে এল রানা, কনসোলের ভেতরে অ্যাসিড ঢালতে শুরু করল। এমন সময় আচমকা খুলে গেল রুমের দরজা, সাদা ল্যাব-স্মক পরা দুই টেকনিশিয়ান ও এক সশস্ত্র গার্ড ভেতরে ঢুকল। প্রথম দু'জনের মধ্যে একজনের হাতে একটা ক্লিপবোর্ড। গার্ডের কোমরে ঝুলছে .৩৮ ক্যালিবারের ব্রাজিলিয়ান রোসি রিভলভার। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনের যমজ ভাই ওটা। দরজার শব্দ শুনেই ফ্লাস্কটা চট্ করে একটা কম্পিউটারের পিছনে গুঁজে দিল ও। কারও চোখে পড়ল না ব্যাপারটা।

রানাকে দেখে থমকে গেল লোকগুলো, হাঁ হয়ে গেল। অবশ্য গার্ড এক সেকেন্ডের মধ্যে সামলে নিল, চার ইঞ্চি ব্যারেলের রোসি লাফিয়ে উঠল তার হাতে। 'আল্টো (হল্ট)!' চেঁচিয়ে বলল সে। পরক্ষণে দরজার সাথেই দেয়ালের গায়ে বসানো একটা বাটন টিপে দিল। জিনিসটা এই প্রথম দেখল রানা। ওটায় চাপ পড়ামাত্র একযোগে অনেকগুলো ওয়ার্নিং বেল বাজতে শুরু করে দিল টেম্পলের এখানে-সেখানে। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। দেখতে দেখতে ডজন খানেক গার্ড এসে জড়ো হলো খোলা দরজায়।

তাদের একজনের ওপর চোখ স্থির হলো রানার। খুব সম্ভব গার্ডদের নেতা সে। প্রায় ওর সমানই হবে লোকটা। হাতে একটা কোল্ট .৩৫৭ পাইথন। মুখটা সরু, চাউনি একদম সাপের মত। তার প্রতিটা অঙ্গভঙ্গি থেকে কর্তৃত্ব ফুটে বের হচ্ছে। 'কে তুমি, অ্যামিগো?' বিস্মিত চেহারায় বলে উঠল লোকটা।

শ্রাগ করল রানা। 'তোমার বসের পুরনো এক বন্ধু। তার সাথে দেখা করতে এসেছি। কোথায় পাব তাকে?'

চাউনি সরু হয়ে উঠল সাপের। 'বসের বন্ধু! আচ্ছা!' আরও

কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, এমন সময় পিছনে কারও দৌড়ে আসার শব্দ উঠল। আরেক গার্ড লোকটা। কাছে এসে ব্রেক কষল সে। নেতার উদ্দেশে স্প্যানিশে হড়বড় করে কি সব বলল। হাঁপাচ্ছে, ঘামছে। পুরোটা বুঝল না রানা, তবে ব্যাটা যে ওপরের দুই গার্ডের খুন হওয়ার ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে, তা তার বলার ধরন দেখেই বুঝে ফেলল।

তার বলা শেষ হতে রানার দিকে ফিরল নেতা। গার্ডরা সবাই একযোগে কথা বলতে শুরু করেছে দেখে কড়া ধমক লাগাল, 'সাইলেন্সো!' একটু পর ওকে বলল, 'অ্যামিগো, সঙ্গে অস্ত্র যা যা আছে, সব বের করে মেঝেতে রাখো ভদ্রলোকের মত। দয়া করে কোন চালবাজি করতে যেয়ো না। তাহলে পস্তাতে হবে।'

নীরবে তার নির্দেশ পালন করল রানা। ওয়ালথার আর স্টিলেটো ঝুঁকে পায়ের কাছে রেখে দিল। ও দুটো দেখে চোখ কোঁচকাল লম্বামুখো: 'আর কিছু নেই?'

মাথা নাড়ল রানা। 'বিশ্বাস না হলে সার্চ করে দেখো।'

ঠোঁট প্রায় না নেড়ে দ্রুত কিছু বলল সে। চারজন গার্ড একযোগে পা বাড়াল, কাছে এসে ঘিরে ধরল ওকে। একজন নিপুণ হাতে সার্চ করল, ইউটিলিটি কেসটা খোয়াল রানা। লক এইডটাও। ওগুলো নিয়ে পিছিয়ে গিয়ে মাথা নাড়ল সে নেতার উদ্দেশে—আর কিছু নেই।

মাথা ঝাঁকাল সে। সন্দেহের চোখে রুমের সবকিছুর ওপর চোখ বোলাতে লাগল। রানা এখানে কি করছিল বোঝার চেষ্টা করছে হয়তো। এক সময় নড়ে উঠল, কিছু নির্দেশ দিল গার্ডদেরকে। একজন মেঝে থেকে ওর অস্ত্র দুটো তুলে নিল, আর কয়েকজন মিলে পাশের ছোট এক রুমে এনে ঢোকাল ওকে।

'অপেক্ষা করো,' নেতা বলল। 'এখনই আসছি আমি।'

দড়াম করে লেগে গেল রুমের দরজা। বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয়া হলো।

ছয়

আধঘণ্টা পর দুই গার্ডসহ ফিরে এল লোকটা। দরজা খুলে ভেতরে রানাকে ভদ্রলোকের মত বসে থাকতে দেখে হাতের পাইথন দোলাল। বের হতে বলছে। উঠে পড়ল ও, করিডরে এসে দাঁড়াল। অন্য দুই গার্ডের একজন রাইফেল ঠেসে ধরল ওর মেরুদণ্ডে। 'হাঁটো!'

পিঠে গুঁতো খেয়ে এগোল রানা। লম্বামুখো নেতার পিছন পিছন হাঁটতে লাগল। ওর পাঁচ ফুট সামনে রয়েছে লোকটা। পথে বেশকিছু টেকনিশিয়ান ও গার্ডের সাথে দেখা হলো, প্রত্যেকেই ঘৃণা আর করুণার চোখে দেখছে রানাকে। নতুন এক রুট ধরে কয়েকটা করিডর ও কয়েক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে ওপর-নিচ করে অবশেষে বড় এক হলে পৌঁছল ওরা।

বিভিন্ন দিক থেকে আরও কয়েকটা করিডর এসে পড়েছে হলে। তারই একটার দিকে এগোল লম্বামুখো, ওটার শেষ মাথার প্রকাণ্ড দরজায় তিনটে নক করে খুলে ফেলল। ওপাশে বিশাল এক হল। সাজগোজ দেখে ওটাকে রানার সেন্ট্রাল চেম্বার বলে মনে হলো।

সিলিঙে প্রচুর আলো জ্বলছে, তবে ঝলমলে দ্যুতি নেই, বরং চাপা আলো ছড়াচ্ছে ওগুলো। সিলিঙের ঠিক মাঝখানে জ্বলছে একটা হাই ইন্টেনসিটি স্পটল্যাম্প, ওটার আলো খুবই উজ্জ্বল। মেঝেতে নিখুঁত এক বৃত্ত রচনা করেছে আলোটা।

দু'দিকের দেয়ালে বইয়ে ঠাসা অনেকগুলো শেলফ। চামড়া বাঁধানো ঝকঝকে মোটা বই থেকে শুরু করে সরু, চটি বই এবং খোলা, কিনারা ছেঁড়া শীটের ফোল্ডার, সবই আছে ওতে। রানার সামনের ও পিছনের দেয়ালে আছে কিছু দুর্লভ সংগ্রহ। সোনার ঢাল-তলোয়ার, মুকুট, গাদা বন্দুক ইত্যাদি।

আলোর বৃত্তের মধ্যে চারজনকে বসা দেখল রানা। দু'জন মাঝবয়সী পুরুষ। একজনের মাথাজোড়া চকচকে টাক, অন্যজনের চোখ দুটো বিরাট, প্রায় মুরগির ডিমের মত। অপর দু'জন মহিলা। একজন মাঝবয়সী, বুক আর নিতম্ব বিশাল তার। চাউনি অন্তর্ভেদী। অন্যজনকে প্রায় যুবতীই বলা চলে। চেহারা-সুরত, দেহের গড়ন মন্দ নয়। তবে চেহারায় তার রাজ্যের বিরক্তি।

আধখানা চাঁদের মত প্রকাণ্ড এক ডেস্ক ঘিরে বসে আছে তারা। ডেস্কের পিছনের বড়সড় সুইভেল চেয়ারটা খালি। ওটা কার অপেক্ষায় আছে বলে দিতে হলো না রানাকে। তলপেটে মৃদু সুড়সুড়ি অনুভব করল।

'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো,' ওর কানের কাছে মুখ এনে চাপা কণ্ঠে বলল নেতাগোছের লোকটা। 'বস্ এখনই আসবেন।'

সময় নীরবে গড়িয়ে চলেছে। তিন গার্ডের পাহারায় সঙের মত দাঁড়িয়ে আছে রানা, ওদিকে চেয়ারে বসা নারী-পুরুষের দলটা নিচু গলায় কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। থেকে থেকে চোখ তুলে ওকে দেখছে। যুবতীর মধ্যে সে কাজের প্রবণতা বেশি দেখতে পেল রানা।

গার্ড দলের নেতার দিকে তাকাল। কে ওর বস্? ভাবল রানা। ফার্নান্দো কোর্টেজ আসলে কে? ও যাকে ভেবে এসেছে, সে-ই কি? লোকটা...পরিবেশ পাল্টে গেছে টের পেয়ে চোখ তুলে তাকাল। ঘুরে ঢুকল বিশালদেহী এক লোক। প্রায় ছয় ফুটের মত দীর্ঘ, চওড়ায়ও তেমনি। মাথাটা দেহের তুলনায় বড়। ঝাঁকড়া,

কাঁচাপাকা চুলে ভর্তি। প্রতিভা দীপ্তি চেহারায়। লক্ষজনের মাঝেও খুব সহজেই শনাক্ত করা যায়।

এক পা টেনে টেনে হাঁটছে মানুষটা।

হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। ওর ধারণাই তাহলে ঠিক! কবীর চৌধুরী! লোকটা এখনও বেঁচে আছে বুঝতে পেরে অবাক হয়েছিল, কিন্তু এ মুহূর্তে তাকে সামনাসামনি দেখে রীতিমত ভিরমি খাওয়ার দশা হলো। এ কোন্ কবীর চৌধুরীকে দেখছে ও?

শেষবার লোকটাকে দেখেছিল চ্যানেল আইল্যান্ডসের লয় পিয়েরেতে। গোল্ডেন সান নামে এক ইয়টের ডেকে। তাকে ও তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে বিস্ফোরিত হয়েছিল ওটা।*

অতবড় এক বিস্ফোরণের পরও লোকটা বেঁচে আছে, এক মিনিট আগেও বিশ্বাস করতে খুব একটা ভরসা হচ্ছিল না ওর। কিন্তু এ মুহূর্তে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। শুধু যে বেঁচে আছে কবীর চৌধুরী, তাই নয়, বরং বহাল তবিয়তেই আছে। সেবার একটা হাত ছিল না তার, একটা চোখ ছিল না। ছিল না মানে, ছিল, নকল ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সবই আছে। এবং সবই মনে হচ্ছে অকৃত্রিম।

রানা তাকে দেখে যেমন অবাক হলো, কবীর চৌধুরীও তেমনি অবাক হলো ওকে দেখে। দাঁড়িয়ে পড়ল চট্ করে। সেই দাঁড়ানোর ভঙ্গি, বড়সড় মাথা ভর্তি কাঁচাপাকা, ঝাঁকড়া চুল—এলোমেলো। সেই প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী...

'হ্যালো, মাসুদ রানা!' বিস্ময় হজম করে বলল লোকটা। ভরাট গলার স্বর গমগম করে উঠল। 'সত্যিই তুমি? তাহলে মানাগুয়ায় ওই লোকটা...?'

'ওসব তুমি বুঝবে না,' বলল রানা। 'হাইথটের ব্যাপার।'

---

* আবার সেই দুঃস্বপ্ন

'বটে,' সামলে নিল কবীর চৌধুরী।

লাইট ওয়েট বিজনেস স্যুট পরে আছে সে, গলায় ক্রিমসনের ওপর সাদা ফোঁটাওয়ালা টাই। তার এক হাতে নিজের ইউটিলিটি কেসটা দেখল রানা। এমনভাবে ধরে আছে, যেন চাইছে ও খেয়াল করুক ব্যাপারটা। এগোল কবীর চৌধুরী, আগের মত এক পা সামান্য টেনে টেনে। উপস্থিত চার নারী-পুরুষের উদ্দেশে কেতাদুরস্ত নড় করে স্প্যানিশে বলল, 'সরি। কিছু সময়ের জন্যে ক্ষমা করতে হবে আমাকে। অনেক বছর পর পুরনো এই বন্ধুটির সাথে দেখা,' মুখ ঘুরিয়ে রানাকে দেখাল সে। হাসছে মিটিমিটি, তবে সে হাসিতে অবজ্ঞা দেখল না ও। স্পষ্ট বোঝা যায়, এখনও বিস্ময় পুরোপুরি কাটেনি তার।

'একটু দেশের খোঁজ খবর নেয়া দরকার, ওর কুশলাদিও। আশা করি কিছু মনে করবেন না আপনারা।'

একযোগে মাথা নাড়ল তারা—করবে না।

ঘুরে রানাকে দেখল কবীর চৌধুরী। 'তারপর, রানা! এগিয়ে এসো, আলোর বৃত্তের মধ্যে দাঁড়াও। টোচেল, ওকে সাহায্য করো,' ডান হাত নাড়ল সে।

লম্বা মুখের লোকটা এগিয়ে এল। বাহু ধরে জায়গামত এনে দাঁড় করাল ওকে। সরে যাওয়ার সময় চাপা গলায় বলল, 'খবরদার! বসের সাথে কোনরকম বেআদবির চেষ্টা করলে ঘাড় মটকে দেব।'

বিতৃষ্ণ চোখে লোকটাকে দেখল রানা। স্প্যানিশে বলল, 'আরেকবার বড়দের কথার মধ্যে কথা বললে চড়িয়ে তোমার কানের পর্দা ফাটিয়ে দেব, বুঝতে পেরেছ?'

রেগে উঠল টোচেল, কিন্তু সামলে নিল। বিড়বিড় করে কী সব বলতে বলতে পিছিয়ে গেল। তবে হাতের পাইথন প্রস্তুত রেখেছে ঠিকই।

'ওই ভুলটা কোরো না, মাসুদ রানা,' বাংলায় বলল কবীর

চৌধুরী। 'ওপরে যে দুই গার্ডকে তুমি খুন করেছ, তাদের একজন ছিল টোচেলের ভাই। ও প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি ধৈর্য ধরতে বলেছি। কাজেই দয়া করে ওকে উস্কে দিয়ো না। ঠিক হবে না সেটা।'

হাসল লোকটা। চিরাচরিত নাটুকে ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'চোখে বিস্ময় দেখে বুঝতে পারছি কি চিন্তা চলছে তোমার মাথায়। হ্যাঁ, আমার এই হাতটা আসল, ডান হাতটা তুলল সে। 'অবশ্য নকলও বলতে পারো তুমি ইচ্ছে করলে। হাজার হলেও অন্যের হাত, সার্জারির সাহায্যে বসিয়ে নিয়েছি। নকল হাতটা তো লস পিয়েরেতে...আর এই চোখটা, এটাও আসল। অন্যের আর কি! ভেবে দেখলাম, মেডিক্যাল সায়েন্স এত বেশি এগিয়ে গেছে যে আজকাল এসব নিতান্তই সাধারণ, মাইনর সার্জারির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তো আমি কেন বসে থাকি? কেন খুঁতগুলো দূর করার চেষ্টা করি না? তাই...'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু একটা খুঁত যে রয়েই গেল এখনও। ওটাকেও রিকন্ডিশন্ড করিয়ে নিলে হত না?'

হা-হা করে হেসে উঠল লোকটা। 'আমার কাঠের পা-টার কথা বলছ? ওটা আমি ইচ্ছে করেই রেখে দিয়েছি। কারণ ওটা আমার ঐতিহ্য, রানা। আমার বৈশিষ্ট্য।'

হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে উঠল সে। প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'এত সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে এখানে তুমি হাওয়া খেতে আসোনি, নিশ্চয়ই কাজে এসেছ। সেটা কি, মাসুদ রানা? ভেতরের প্রতিটা ইঞ্চি জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হয়েছে, অথচ কোথাও বোমা বা আর কিছু পাওয়া যায়নি। তাহলে?'

জবাব দিল না রানা। স্বস্তির চাপা নিঃশ্বাস ছাড়ল। অ্যাসিডের ফ্লাস্কটা ছিল সেলফ ডেসট্রাক্টিঙ ডিভাইস। অ্যাসিড শেষ হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। ওটা যখন খুঁজে পাওয়া যায়নি, তখন...

'বলো, মাসুদ রানা। মুখ বন্ধ রেখে পার পাবে না তুমি। বোমা সেট করতে…'

'বোমা সেট করতে আসিনি আমি,' বলল ও।

'তাহলে কেন এসেছ, এখানকার ছবি তুলতে?' ইউটিলিটি কেস থেকে ওর মাইক্রোফিল্ম ক্যামেরাটা বের করল কবীর চৌধুরী।

'হ্যাঁ।'

দ্রুত মাথা নাড়ল লোকটা। 'বিশ্বাস করতে পারলাম না। ন ছবি তোলার উদ্দেশ্যই যদি থাকত, তাহলে আর কাউকে বিসিআই। তোমার মত গুরুত্বপূর্ণ একজনকে পাঠাত না। তোমাকে অন্তত মানায় না। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা, নকার, মানে ভেতরের কোন ছবি নেই। যা আছে, সব

ব থাকল ও। ক্যামেরা ছিল মিশনের দ্বিতীয় অংশ। ভতরের ছবি যতগুলো সম্ভব তোলার কথা ছিল ওর, প্রয়োগের পর, সুযোগ পেলে। আগে নয়। তাই রেনি রানা।

ফেলল কবীর চৌধুরী। থাবা মেরে টেবিলের বকিছু ফেলে দিল। গর্জে উঠল, 'কেন এসেছ, ম নিয়ে এসেছ?'

পায়ের চাপা শব্দ উঠতে শক্ত হয়ে উঠল ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামলে নিল। সল কবীর চৌধুরী। এবার অহঙ্কার ও ষ্ক, রানা। এখানে অন্তত হত্যা করা জন্যে অভিনব এক মৃত্যুর কথা ভেবে মঞ্চল অতীতে কাদের ছিল, জানো

ত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের জাঁকজমক ভরা পস্থিতিতে হত্যা করা হত। কি

ভাবে জানো? জ্যান্ত অবস্থায় বুক চিরে হৃৎপিণ্ড বের করে নেয়া হত তাদের। তোমার জন্যেও…বাই দ্য ওয়ে, রানা, এ পর্যন্ত পৌছলে কি করে তুমি? কোন সূত্রে? জাস্ট কৌতূহল আর কি!'

শ্রাগ করল রানা। 'জিয়াউল হক।'

'জিয়াউল হক?' চোখ কুঁচকে উঠল কবীর চৌধুরীর।

'হ্যাঁ। আমাদের মেক্সিকো সিটি এজেন্ট। যাকে তুমি গতমাসে পাহাড় থেকে ফেলে হত্যা করেছ।'

'আমি নই। টোচেল।'

'ওই হলো। তোমার নির্দেশ ছাড়া করেনি।'

'তা বটে,' মাথা দোলাল কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু লোকটা খুব বাড়াবাড়ি করছিল। বাই দ্য ওয়ে, লোকটা আমাকে সন্দেহ করল কেন?'

'অনেক বছর আগে তুমি যখন বটুলিনাস টক্সিন নিয়ে ঢাকায় ধ্বংসের খেলায় মেতে ছিলে, জিয়া তখন ডিবিতে ছিল। আমার মত সে-ও তোমার পিছনে…'

'আই সী!' শ্রাগ করল কবীর চৌধুরী। 'সাঙ্ঘাতিক শার্প মেমোরি বলতে হবে। ছায়ার মত লেগে ছিল আমার পিছনে।'

'চোরের পিছু নিলে পুলিসের দোষ হয়, ভালই বলেছ তুমি,' রানা বলল।

'চোর, অ্যাঁ? হা-হা-হা!' ভরাট গলায় হেসে উঠল লোকটা। 'তুমিও মন্দ বলোনি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পা চাটা কুকুর তুমি, এর চেয়ে ভাল আর কোন বিশেষণ তোমার কাছে আশা করা বোকামি হবে। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে ইচ্ছেমত আইন তৈরি করে তোমাদের সমাজের গুরুজনেরা। তার ভয় দেখিয়ে নির্বোধ সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে রেখে তাদেরই চোখের সামনে লুটপাটের প্রতিযোগিতায় মেতে থাকে। তাদের কাণ্ড দেখলে চোরেরাও হয়তো লজ্জায় মুখ লুকাবার জায়গা খুঁজবে। যে তাদের নষ্ট সিস্টেমের বিরুদ্ধে কথা বলবে, প্রতিবাদ করবে, সে-ই

তোমাদের ভাষায়··· যাকগে সেসব। পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটলে শুধু দুর্গন্ধই ছড়াবে, কাজের কাজ হবে না কিছু। শুধু এটুকু জেনে রাখো, মাসুদ রানা, আমি নিজের সমাজ নিজের মত করে গড়ে নিতে অভ্যস্ত। সেখানে আমিই সমাজপতি। তুমি, তোমরা, সে সমাজে অনাহূত।

'কথায় বলে নিজের ঢাক নিজে পেটাতে নেই। তবে বাধ্য হয়ে বলছি, আমি যে কি, তার কিছুটা নমুনা হয়তো ঢাকা থেকে দেখেই এসেছ। এখন বাকিটা দেখতে পাবে। খুব শিগগিরি···সে প্রসঙ্গ তুলেই বা লাভ কি? আমি কি করতে যাচ্ছি, তা তো রেডিওর ঘোষণাতেই বিস্তারিত বলেছি।'

'বলেছ,' রানা বলল। 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রিফ্রিজারেটর নির্মাণ করেছ তুমি।'

মাথা নাড়ল কবীর চৌধুরী। 'ঠিক তা নয়। বলেছি, রেডিও ওয়েভের সাহায্যে পৃথিবীর যে কোন শহরের ওপর একটা করে অদৃশ্য পাহাড় সৃষ্টি করতে পারি আমি। ট্রপোস্ফিয়ারের এয়ার কারেন্টের মধ্যে। ইচ্ছেমত ছোট-বড় করতে পারি তার আকার। বাংলাদেশে যে নমুনা খাড়া করেছিলাম, সেটা ছিল সবচেয়ে ছোট। প্রতি মিনিটে গড়ে পঁচিশ লক্ষ ঘনফুট তুষারপাত ঘটাতে পারে ওগুলো। পারত আরকি। সে ক্ষেত্রেও কিছুটা ছাড় দিয়েছি আমি বাংলাদেশকে, মিনিটে মাত্র দশ লক্ষ ঘনফুট তুষারপাত ঘটিয়েছি।'

'বড় দয়ার শরীর তোমার,' ফোড়ন কাটল রানা। 'মাত্র শ'চারেক মানুষ মেরে রেহাই দিয়েছ।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কবীর চৌধুরী। 'তোমার মধ্যে আগের মত ভাবাবেগ আজও আছে দেখছি, রানা। রাবিশ! চারশো কেন, চার লাখ মরলেই বা কি ক্ষতি ছিল, বলো দেখি! মাত্র পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের ছোট্ট একটা দেশ, তারই জনসংখ্যা তেরো কোটি! মাত্র ত্রিশ বছরে এই হাল হয়েছে

দেশের, দ্বিগুণ হয়ে গেছে জনসংখ্যা। কি হবে ভেবে দেখছ কখনও? পিঁপড়ের মত গিজগিজ করবে মানুষ, রাস্তায় পা ফেলার জায়গা খুঁজতে সমস্যা হবে। এই চারশোজনের মৃত্যুকে বরং আমার তরফের ছোট একটা কন্ট্রিবিউশন হিসেবে ধরে নেয়া উচিত ছিল তোমাদের, রানা। আমি অন্যায় কিছু করিনি।'

ও রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিল সে। 'আমি জানি তুমি কি বলবে। আমি অপরাধী, আমি নির্দয় খুনী, ঠিক? অনেকদিন থেকে বাইরে আছি ঠিকই, কিন্তু দেশের খবর যতদূর সম্ভব রাখার চেষ্টা করি। আমার জন্যে না হয় চারশো মানুষ মারা গেছে, কিন্তু তুমি যে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছ, তাদের মন্ত্রী, সাংসদ, আমলা, তাদের আত্মীয়স্বজন আর গুণধর সন্তানদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সন্ত্রাসে প্রতিদিন কতজন মরছে, সে হিসেব কখনও করেছ? রোজ কতজনকে তারা ভিটেমাটি ছাড়া করছে, রাখো সে খবর?'

উঠে পড়ল কবীর চৌধুরী। পিছনে হাত বেঁধে পায়চারি শুরু করল। 'যাক, সেসব। তোমরা দেশের মা-বাপ। দেশের ভালমন্দ তোমরাই ভাল বুঝবে। তবে ক'দিন আগে যা ঘটে গেছে, তার পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছি না আমি। আসলে সে ক্ষমতা এখনও অর্জন করতে পারিনি আর কি।'

কপাল কুঁচকে উঠল রানার। 'এত কিছু ঘটাবার পরও বলছ ক্ষমতা অর্জন করতে পারোনি!'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'ঠিকই বলেছি।'

'অর্থাৎ?'

মুচকে হাসল লোকটা। 'সব সিক্রেট জেনে নিতে চাও? তা বেশ, আমারও আপত্তি নেই জানাতে। কারণ আর যা-ই ঘটুক, এবার এই টেম্পল থেকে প্রাণ নিয়ে বের হতে পারছ না তুমি। শোনো তাহলে, আমার আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে কোথাও একনাগাড়ে তুষারপাত ঘটাতে গেলে সেখানে বিশেষ এক ট্রান্সমিটার স্থাপন

করতে হয়। বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, আমেরিকা বা সৌদি আরবে ওই জিনিস নেই আমার।'

'তাহলে ব্যাপারটা ঘটল কি করে?' প্রশ্ন করল রানা।

'এখানকার অত্যন্ত শক্তিশালী সেন্ট্রাল ট্রান্সমিটারের সাহায্যে। এখানেই আছে সেটা, আমার হাতের নাগালে। ওটার সাহায্যে এমনকি নর্থ পোলেও অতিরিক্ত তুষারপাত ঘটাতে পারি আমি, কিন্তু তা হবে খুবই সীমিত সময়ের জন্যে। তুষারের পরিমাণও হবে অল্প। যেখানে যেখানে ট্রান্সমিটার থাকবে, সেসব জায়গার কথা আলাদা। সেখানে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা তুষারপাত ঘটাতে পারব আমি। আমার হাতে এমুহূর্তে মাত্র চারটে ট্রান্সমিটার আছে, সব ল্যাটিন আমেরিকার জন্যে।

'প্রথমে এই অঞ্চলের ব্যবস্থা করব আমি, তারপর ধরব গণতন্ত্রের এক নম্বর ঠিকাদার আমেরিকাকে। ওদের...' রানাকে হাসতে দেখে থেমে গেল কবীর চৌধুরী। চোখ কুঁচকে তাকাল। 'আমি হাসির কিছু বলেছি বুঝি?'

'তা বলোনি,' মাথা ঝাঁকাল ও। 'কিন্তু আমি ভাবছি, যে দেশ বছরে আট মাসই বরফে ডুবে থাকে, তার ওপর তুষারপাত ঘটিয়ে কি লাভ হবে আশা...'

'আমি কখন বলেছি আমেরিকায় শুধু তুষারপাতই ঘটাব?' অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল কবীর চৌধুরী।

রানার হাসিটা হোঁচট খেল। 'না, তা অবশ্য বলোনি। কিন্তু...তাহলে আর কিভাবে...'

'সিস্টেম রিভার্স করে, খরায় শুকিয়ে মারব আমি ওদের!' ধমকের সুরে বলল সে। 'কয়েক বছর টানা খরার কবলে পড়লে গতরের তেল শুকিয়ে যাবে। সম্পদ আর ক্ষমতার জোরে ধরাকে সরা ভাবে তো, এবার দেখব।'

মনে মনে চমকে উঠল রানা, বলে কি! এ যে অবিশ্বাস্য। ধাপ্পা দিচ্ছে না তো? 'বুঝলাম না। প্রকৃতির নিয়মে আকাশে মেঘ জমলে বৃষ্টি হবেই, তুমি...'

'হ্যাঁ,' টেনে বলল কবীর চৌধুরী। 'মেঘ "জমলে" হবে। কিন্তু আমি যদি জমতে না দিই?'

'তার মানে?'

'মানে খুব সোজা, মাসুদ রানা। তুষার যেমন ঝরাতে পারি, তেমনি সময়ে বৃষ্টিও ঠেকিয়ে দিতে পারি আমি ইচ্ছেমত। ওদেশের যেখানেই মেঘ জমবে, বিশেষ কায়দায় ছত্রভঙ্গ করে দেব আমি। ঝেঁটিয়ে দুনিয়াছাড়া করে দেব,' বলেই প্রচণ্ড অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে। শরীর পিছনে হেলিয়ে সিলিঙের দিকে মুখ করে হাসছে, গমগম করছে বড়সড় চেম্বারটা। ডেস্ক ঘিরে বসা দলটা বোকার মত ঘনঘন পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে। ওরা দু'জন বাংলায় কথা বলছে বলে কিছু বুঝতে না পেরে অপ্রস্তুত।

একসময় হাসি থামল লোকটার। চোখের পানি মুছে রানার দিকে ফিরল। 'এবার পুরোটা বুঝেছ আশা করি?'

সম্মোহিতের মত মাথা দোলাল রানা। তাক্ লেগে গেছে ওর। সত্যিই যদি এত ক্ষমতা অর্জন করে থাকে লোকটা, তাহলে...ভাবনার খেই হারিয়ে ফেলল। এত বিশাল প্রতিভার অধিকারী একজন বাঙালী, বাংলাদেশী, ভাবলে বুক ফুলে ওঠার কথা, কিন্তু যখন মনে পড়ে লোকটা বিপথগামী, সুস্থ সমাজের বিরোধী, তখন...'

'যাক, অনেক কথা হলো,' আবার শুরু করল কবীর চৌধুরী। ফিরে গিয়ে বসল নিজের চেয়ারে। 'এরা এই অঞ্চলের মানুষ, বাংলা বোঝে না। কাজেই আর না, অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে।'

'কারা এরা?' রানা বলল।

'আমার সহকর্মী,' ঝাঁকড়া মাথা দোলাল সে। স্প্যানিশে বলল, 'এই অঞ্চলের চার দেশে আমার প্রতিনিধিত্ব করছে।'

'অর্থাৎ তোমার চারটে ট্রান্সমিটার নিয়ন্ত্রণ করছে, এই তো?'

'তিনটে নিয়ন্ত্রণ করছে।'
'মূলটা করছ তুমি!'
'এবারও হ্যাঁ।' চোখ মটকাল লোকটা।
মনে মনে স্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল ও। করাচ্ছি তোমার নিয়ন্ত্রণ।
'এরা কোন্ কোন্ দেশের...'
'কামন, রানা। আর কবে সাবালক হবে তুমি? কোথায় কোন্ প্রশ্ন করতে হয় না, কবে শিখবে তা?'
'তা এই অঞ্চলকেই প্রথম শিকার হিসেবে কেন বেছে নিলে তুমি?'
'কোথাও না কোথাও শুরু তো করতেই হবে, তাই। এমনিতে বিশেষ কোন কারণ নেই। তাছাড়া অনেকদিন থেকে এই অঞ্চলে আছি, এদিকের সবকিছু নখদর্পণে, তাই...'
'তাই এদের প্রতিই সবার আগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাইছ,' তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল ও।
শ্রাগ করল কবীর চৌধুরী। 'তোমার যদি তাই মনে হয়, তাহলে তাই।'
'তোমার কি মনে হয়?' তিক্ত কণ্ঠে স্প্যানিশে বলল ও। 'উষ্ণমণ্ডল এটা। এখানে যদি দিনরাত তুষারপাত ঘটতে শুরু করে, কি হবে? এদের রাবার, কলা, বহু মূল্যবান কাঠ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে না? কফি, কোকো, আর সব শিল্প কারখানা, থাকবে কিছু? রাতারাতি বিধ্বস্ত হয়ে যাবে না গোটা সেন্ট্রাল আমেরিকান অর্থনীতি?'
হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি কলল উন্মাদ লোকটা। 'এই অঞ্চলটা অনুন্নত। এখানকার মানুষ কষ্ট করে যা উৎপাদন করে, পশ্চিমারা লুটেপুটে নিয়ে যায়। ওদেরকে এই অঞ্চল থেকে ভাগানোর জন্যেই আমার এই প্রচেষ্টা। ওরা চলে গেলে এ অঞ্চলের মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। সেদিক থেকে

বিবেচনা করলে আমি বরং উপকারই করছি এদের। আমার সহকর্মীরাও তাতে একমত।'
চার প্রতিনিধিকে মাথা দুলিয়ে সায় দিতে দেখে অবাক হলো রানা। ভাবল, ওদের একটাও সুস্থ নয়। সব ক'টা উন্মাদ।
'হাজার হাজার মানুষকে শীতে জমিয়ে শেষ করে এদের উপকার করবে তুমি?' বলল রানা।
'ও কিছু নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রকৃতির নির্মম আচরণের শিকার এরা। এসব এদের গা সওয়া হয়ে গেছে। তাছাড়া, বিশ্বকে আমি আমার সমস্ত দাবি নিঃশর্তে মেনে নেয়ার সুযোগ দিয়েছি। যদি সেসব মানা না হয়,' শ্রাগ করল সে। 'আমি নিরুপায়।'
টেবিলে আঙুল দিয়ে দুটো টোকা মারল কবীর চৌধুরী। 'পনেরো দিন সময় দিয়েছিলাম আমি। আগামীকাল তা শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু তোমার এখানে এসে হাজির হওয়ায় প্রমাণ হয়ে গেছে দাবি অগ্রাহ্য করা হয়েছে আমার। কাজেই সময়টা আমি এগিয়ে এনেছি বাধ্য হয়ে।'
'কখন?' ভেতরে ভেতরে ঘাম ছুটে গেল ওর।
'এখন, রানা। এই মুহূর্তে,' হাসল সে। ডেস্কের নিচের দিকের কোথাও বসানো একটা সুইচ টিপল, সঙ্গে সঙ্গে টপের নিচ থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল একটা কন্ট্রোল বোর্ড। বেশ কয়েকটা টগল সুইচ রয়েছে ওটায়। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে সেগুলোর ওপর আঙুল নেচে বেড়াতে লাগল কবীর চৌধুরীর। লাল-সবুজ আলো জ্বলে উঠল বোর্ডের সর্বত্র। কোনটা একনাগাড়ে জ্বলছে, কোনটা টিপ্ টিপ্ করছে।
এখন না! মনে মনে আঁতকে উঠল রানা। এখনই শুরু করে দিয়ো না! চিৎকার ঠেকাতে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। অন্য তিন ট্রান্সমিটারের কথা ভাবছে, কোথায় ওগুলো? কোন্ কোন্ দেশে? কাজ শুরু করার সঙ্কেত পৌঁছে গেছে ওগুলোয়? অ্যাসিডের কথা

মনে পড়তে একটু শান্ত হলো ও। অন্তত ওই জিনিসের কাজ ঠেকানোর ক্ষমতা এখন কারও নেই।

একটা মিটারের দিকে তাকিয়ে লোকটাকে চোখ কোঁচকাতে দেখে বুকের ভেতর চাপা উল্লাস বোধ করল রানা। কিন্তু না, সেটিং অ্যাডজাস্ট করে চলেছে সে। 'আমি কিন্তু তোমাকে আশা করছিলাম, রানা।'

'আমাকে?' অবাক হলো ও।

'হ্যাঁ।' মুখ তুলে ওকে দেখল লোকটা। 'তাই কিছু বিশেষ সতর্কতামূলক পদক্ষেপও নিয়ে রেখেছি। ব্রাঞ্চ ট্রান্সমিটারগুলো যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সে ব্যবস্থা করেছি।'

'কি!' ঢোক গিলল রানা। 'তার মানে ওগুলোর ওপর তোমার নিয়ন্ত্রণ নেই?'

'অবশ্যই আছে। এখান থেকে পাঠানো সঙ্কেতের সাহায্যে ওর সব ক'টাকে চালু করতে পারি আমি,' বোর্ডে টোকা দিল কবীর চৌধুরী। 'বন্ধও করতে পারি।'

আতঙ্কের শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল ওর মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে। 'তুমি বলতে চাইছ, একবার ওগুলো "অন" করা হলে "অফ" করতে রিমোট কন্ট্রোলের প্রয়োজন হবে?'

মাথা দোলাল সে। 'ঠিক। নিজের এবং স্থাপনাগুলোর ইনশিওরেন্সের খাতিরে করতে হয়েছে,' এক চোখ টিপল। 'এখানকার সবকিছু ধ্বংস করে দেয়া হলেও লাভ হবে না। আমার পাহাড়ের কাজ তাতে বন্ধ হবে না। বরং তার ফল হবে আরও ভয়ঙ্কর। আরও সর্বনাশা।'

ঢোক গিলল রানা। 'সে কিরকম?'

'আমার চারটে ট্রান্সমিটার,' চার আঙুল তুলে দেখাল লোকটা। 'যদি তার মধ্যে একটাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়, সেটা হবে চার খুঁটির তাঁবুর একটা খুঁটি উপড়ে ফেলা। তখনও দাঁড়িয়ে থাকবে তাঁবু, তবে তিন পায়ে, অন্য কনফিগারেশনে। কিন্তু এর ফলে

আবহাওয়ার যে তাণ্ডব নৃত্য শুরু হবে, তার কথা ভাবতেও ভয় হয় আমার। যদি আমার ফোর্স ফিল্ড ভারসাম্য হারায়, তাহলে...সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কথা, যদি আমার এই ট্রান্সমিটারটা কোন কারণে আউট অভ অর্ডার হয়ে যায়, তাহলে অন্য তিনটেকে সঙ্কেত পাঠানোর পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তার মানে অফ করা যাবে না ওগুলো। ফল হবে,' থেমে মৃদু হাসল সে। 'খুব সম্ভব কয়েক দিনের মধ্যে তুষার আর বরফের তলায় চিরতরে কবর হয়ে যাবে গোটা সেন্ট্রাল আমেরিকার।'

তার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে এক মুহূর্ত সময় লাগল রানার। সঙ্গে সঙ্গে গায়ের সমস্ত পশম দাঁড়িয়ে গেল তীব্র আতঙ্কে। 'সর্বনাশ!' টোচেলের গুলির ভয় অগ্রাহ্য করে চিৎকার করেই কবীর চৌধুরীকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল রানা। 'দাঁড়াও! থামো, কবীর চৌধুরী! এখনই কিছু করতে যেয়ো না। তুমি...' আর কিছু বলার সুযোগ পেল না ও, ঘাড়ে টোচেলের এক জুডো চপ খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

দুই গার্ড এসে মেঝের সাথে ঠেসে ধরল ওকে, আরেকজন দমাদম ঘুসি মেরে চলল পিঠে-কাঁধে। ফুসফুস খালি হয়ে যাওয়ায় দম নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগল রানা। তবু ওর মধ্যেই হিস্টিরিয়ার রুগীর মত তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, 'অন কোরো না! ট্রান্সমিটার অন করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে!'

'দুঃখিত, রানা,' বলল সে। 'আমি অলরেডি অন করে দিয়েছি। তিন ট্রান্সমিটারের মিটার রীডিংও চমৎকার দেখতে পাচ্ছি। একদম ঠিক আছে। এখন ওগুলোকে সিনক্রোনাইজ করতে হবে।'

মেঝে থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে রানা। দু'চোখ বিস্ফারিত। সারা গা কাঁপছে। যদি যন্ত্রপাতি ঠিকমত কাজ শুরু করে থাকে, তাহলে ওর মিশন ব্যাকফায়ার করবে। ফলাফল হবে মর্মান্তিক। স্যাবোটাজ ঘটাতে এসে উল্টো করে বসেছে ও না

জেনে।

নাটকীয় ভঙ্গিতে বড় এক সুইচে আঙুল রাখল লোকটা। 'এবার পাওয়ার অ্যাপ্লাই করতে হবে,' হাসল মুখ টিপে। টিপে দিল সুইচটা।

আলোর তেজ কমে গেল চেম্বারের, মায়ান টেম্পলের গভীর তলদেশে জেনারেটরের আওয়াজ আরও ভারী, আরও গুরুগম্ভীর হয়ে উঠল। তারপরই একের পর এক ঘটনা ঘটতে শুরু করল। রানার করোডিং অ্যাসিডের ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা জেনারেটর বহুগুণ বেশি বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে আরম্ভ করায় এয়ার-ডাক্টস্ থেকে ছোট ছোট যন্ত্রপাতি ছিট্‌কে বের হয়ে আসতে লাগল। অনিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজের চাপে ভাঙাচোরার বিচিত্র আওয়াজ উঠল চারদিকে।

মানুষের দূরাগত ক্ষীণ চিৎকার শুনতে পেল রানা। দুর্গন্ধে ভরে উঠল বাতাস। কবীর চৌধুরী ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে কোথাও মস্ত কোন গোলমাল ঘটে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে পাগলের মত একটার পর একটা সুইচ অফ করছে সে, ডায়াল ঘুরিয়ে জিরোতে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল আতঙ্কিত কবীর চৌধুরী। 'এ হতে পারে না! অসম্ভব! এ-এ হতে পারে না!'

তার ঠিক্‌রানো চোখের সামনে অ্যাক্সিলারেশন মাস্টারের কাঁটা ডেঞ্জার জোনে উঠে পড়ল। ওভারলোড পড়ায় কন্ট্রোল বোর্ডের ধাতব প্যানেলের ফাঁক দিয়ে হলুদ ধোঁয়া বের হতে শুরু করেছে। সামনে বসা দলটার প্রত্যেকে আতঙ্কিত। বয়স্ক মহিলা কাশছে ভীষণভাবে, যুবতীর চেহারা রক্তশূন্য। ঠোঁট ফ্যাকাসে।

এদিকে টোচেলসহ গার্ডদের অবস্থাও প্রায় একইরকম। মার থেমে গেছে, পিঠের ওপরের চাপও কমে গেছে রানার। কবীর চৌধুরীর চোখে পানি দেখতে পেল ও। আবেগে কেঁদে ফেলেছে

না ধোঁয়ায় আপনাআপনি বেরিয়ে এসেছে বোঝা গেল না।

'মাসুদ রানা!' উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠল সে। 'তুমিই এই সর্বনাশ ঘটিয়েছ। তুমি...'

আচমকা বিস্ফোরিত হলো কন্ট্রোল বোর্ড, পরক্ষণে তীব্র নীলচে আলোর ঝলকানির সাথে লাফ দিয়ে উঠল গোটা চেম্বার। ধোঁয়ায় আঁধার হয়ে গেল সবকিছু। বিস্ফোরণের ধাক্কায় ওর পিছনের গার্ডরা চিৎকার করতে করতে ছুটে পালাল। নাক মেঝেতে ঠেসে রেখে দু'হাতে মাথা আড়াল করে শুয়ে আছে ও, শূন্যে শ্রাপনেলের মত তীব্রবেগে ছোটাছুটি করছে কাঁচ আর ধাতব টুকরো।

অনেকক্ষণ পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে আসতে মুখ তুলল রানা। এখনও ধোঁয়ায় ভরে আছে ভেতরটা, কুয়াশার মত ঘুরপাক খাচ্ছে। সামনেই ফাটা টম্যাটোর মত দু'ভাগ হয়ে আছে কবীর চৌধুরীর ডেস্ক ও কন্ট্রোল বোর্ড। এদিকে পড়ে আছে চারটে মৃতদেহ, চার প্রতিনিধির। যুবতীর নির্মম মৃত্যু হয়েছে। ধাতব প্যানেলের একটা টুকরো গলাটাকে প্রায় দু'ফাঁক করে ফেলেছে তার, চেয়ারে বসেই মরেছে বেচারী। অন্য তিনজন মেঝেতে পড়ে আছে একেক ভঙ্গিতে। কবীর চৌধুরীর কোন চিহ্নই নেই। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন সে। রানার একটু পিছনে দুই গার্ড মরে পড়ে আছে। টোচেল হাওয়া।

দূরাগত চেঁচামেচির শব্দে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে পড়ল রানা। গার্ডরা চেঁচাচ্ছে নিশ্চয়ই, এসে পড়বে যে-কোন মুহূর্তে। এলোমেলো পায়ে প্রতিনিধিদের মৃতদেহগুলোর দিকে এগোল ও, সার্চ করতে লাগল ওগুলো। মানুষগুলোর পরিচয় জানতে হবে, কে কোথাকার তাও। তাহলে হয়তো অন্য ট্রান্সমিটারগুলোর খোঁজ বের করা যাবে।

তিক্ত হাসি ফুটল রানার মুখে। এসেছিল মিশন শেষ করতে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটা শুরু হলো মাত্র।

সাত

বয়স্ক মহিলার নিথর দেহের পাশেই পড়ে থাকা তার বড়সড় হাতব্যাগটা তুলে নিল রানা। সবক'টা দেহ সার্চ করে পাসপোর্ট, আইডি কার্ডসহ কাগজপত্র যা যা পেল, সব ওটায় ভরল। তারপর ক্যাভালরি ডিসপ্যাচ কেসের মত ওটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে যাবে বলে এগোল। পথে পড়ে থাকা মৃত এক গার্ডের রাইফেলও তুলে নিল।

ঠিক তখনই একাধিক পায়ের শব্দ উঠল বাইরে। অস্ত্র বাগিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরল রানা। প্রবেশ পথে বেশ কয়েকজন গার্ড দেখতে পেল। ওকে দেখে নিশ্চল হয়ে গেছে লোকগুলো, হাঁ হয়ে গেছে। চোখ পিটপিট করছে, হতভম্ব। হাতে অস্ত্র আছে, কিন্তু ওগুলো তোলার কথা মনে পড়ল না কারও।

নিজেরটা দুলিয়ে দাঁত খিঁচাল রানা, অস্ত্র মাটিতে রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে নির্দেশ দিল নীরবে। ব্যাটাদের কেউ একজন যদি সাহস করে তৎপর হত, সমস্যায় পড়ে যেত রানা, কিন্তু তা ঘটল না। কেউই নায়ক হওয়ার আগ্রহ দেখাল না। একজন একজন করে রাইফেল-পিস্তল রেখে দিল পায়ের কাছে।

এবার নতুন নির্দেশ দিল ও একই ভঙ্গিতে, পা দিয়ে ঠেলে অস্ত্রগুলো ওর দিকে এগিয়ে দিতে বলল। তাই করল লোকগুলো। এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো ও, দূর থেকে ঘুরে তাদের পিছনে চলে এল। ওর চাউনিতে বিপদসঙ্কেত দেখে গার্ডদের কেউ

একচুলও নড়ল না, দাঁড়িয়ে থাকল পুতুলের মত।

নিশ্চিত হওয়ার জন্যে দেয়ালে হেলান দিল রানা। পাথরের দেয়াল প্রায় বরফের মত ঠাণ্ডা। দূর থেকে আরও অনেক মানুষের গলা ভেসে আসছে। অর্থহীন হই-হই করছে লোকগুলো! দ্রুত কেটে পড়ার তাগিদ অনুভব করল রানা। একটা ইন্টারসেকশনে পৌঁছে আশান্বিত হলো। চকিতে পিছনে তাকিয়ে হতাশও হলো একইসঙ্গে। ছোট একটা করিডর ওটা, কোনদিকে যাওয়ার পথ নেই।

ফের এগোল ও, চোখ পড়ে আছে নিরস্ত্র গার্ডদের ওপর। নতুন দল কখন এসে হাজির হয়, সেই ভয়ে আছে। একটু পর আরেক ইন্টারসেকশনে পৌঁছে ঘুরে তাকাল, খুশি হয়ে উঠল এক প্রস্থ সিঁড়ি দেখে, ওপরে উঠে গেছে। এফএএল দুলিয়ে পুতুলগুলোকে নীরব হুমকি দিয়ে দ্রুত পিছিয়ে এল রানা, ঝেড়ে দৌড় লাগাল ওপরদিকে। সিঁড়ির মাথায় ল্যান্ডিং, তার একদিকের দেয়াল ধসে গেছে, ভেতর থেকে পাইপিং, ওয়্যারিঙের ধাতব আবরণ বেরিয়ে আছে। হিস্‌হিস্ আওয়াজ বের হচ্ছে কোন পাইপ থেকে।

ওদিকে নিরস্ত্র করে রেখে আসা গার্ডরা তৎপর হয়ে উঠেছে এরমধ্যে। অন্ধের মত গুলি ছুঁড়ছে। তার আওয়াজে মনে হচ্ছে কুয়োর মধ্যে বোমা ফাটছে বুঝি। আচমকা ওর বাঁ দিকের এক আলকোভে গান মায্‌লের ঝলক দেখে ঝপ্ করে বসে পড়ল রানা। পরপর তিনটে গুলি হলো, ওপরের দেয়াল থেকে একরাশ প্লাস্টার খসে পড়ল ওর মাথায়, কাঁধে। ভয় পেয়ে গেল রানা। মনে হলো ফাঁদে পড়েছে বুঝি। বের হওয়ার পথ নেই কোনদিকে।

আবার গুলি করার জন্যে রাইফেল তুলেছিল লোকটা, কিন্তু তার আগেই দু'বার গর্জে উঠল ওর এফএএল। ছিটকে পিছনের দেয়ালে গিয়ে পড়ল সে, তার সাথে মাথাও ভীষণ জোরে ঠুকে

গেল। গোড়া কাটা কলাগাছের মত ঝুপ্ করে আছড়ে পড়ল লোকটা। কাছে গিয়ে তার রিভলভার তুলে নিল রানা, পিছনের সিঁড়ি লক্ষ্য করে ওটার চেম্বার খালি করে ফেলল।

তখনও বাঁকের আড়ালে ছিল লোকগুলো, কারও গায়ে লাগেনি গুলি। তবু ওতেই কাজ হলো। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ওপাশে। সিঁড়িতে কয়েকটা ভারী দেহের গড়ানোর আওয়াজ ও খিস্তি শুনে অনেক কষ্টে হাসি চাপল রানা। ভাঙা দেয়ালের কোথাও দিয়ে বের হওয়ার পথ পাওয়া যায় কিনা, খুঁজে দেখতে লাগল মরিয়া হয়ে।

নেই। নিচে দলটা আবার তৎপর হয়ে উঠছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর। সিঁড়িতে জুতোর হাল্কা শব্দে মনে হচ্ছে দুয়েকজন হয়তো সন্তর্পণে উঠে আসার চেষ্টা করছে। ওরা যত নীরবে কাজ করতে চাইছে, আওয়াজগুলো তত্তই জোরাল হয়ে কানে আসছে রানার।

কাজ থামিয়ে হাত তুলে আনতে যাচ্ছিল ও, এমন সময় ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া লাগল আঙুলে। উন্মত্তের মত এক হাতে দেয়ালের ছোট বড় পাথরের টুকরো সরাতে শুরু করল ও, সব ছুঁড়ে দিতে লাগল সিঁড়ির বাঁকের দিকে। ওখানে বাড়ি খেয়ে কিছু থেমে গেল, কিছু ড্রপ্ খেতে খেতে রওনা হয়ে গেল নিচের দিকে। আরেক দফা হুটোপুটির শব্দ উঠল, তার সাথে স্প্যানিশে 'বাবারে!' 'মারে!' ধরনের কাতরধ্বনি।

বাতাস বাড়ছে টের পেয়ে পূর্ণোদ্যমে হাত ও রাইফেলের বাঁট চালাতে লাগল রানা, অল্পক্ষণের মধ্যে বড়সড় এক ফাঁক তৈরি করে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল। আনন্দে লাফিয়ে উঠল বুক। সামনেই উঁচু খিলান, তার ওপাশে সেই সরু, দীর্ঘ কাঠের সিঁড়ি। যে সিঁড়ি দিয়ে নেমেছিল ও।

এক লাফে এপাশে চলে এল রানা। ছাদে ওর জন্যে কি অপেক্ষা করছে, তা ভেবে এক মুহূর্তও নষ্ট না করে তীরবেগে

ওপরদিকে ছুটল। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। পিছনের দলটা ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে সামনে কি ঘটছে, কেউ একজন চিৎকার করে ওকে ধাওয়া করতে বলছে সঙ্গীদেরকে।

ভয়ে ভয়ে ছাদে উঠে এল ও। কোন গুলি হলো না, অন্তত সঙ্গে সঙ্গে। কপ্টারটাকে ঘিরে উজনখানেক গার্ডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। ওড়ার জন্যে প্রস্তুত ওটা, রোটরের ডাউন ওয়াশের তোড়ে চোখ তুলতে পারছে না লোকগুলো। পেন্ডুলামের মত দোল খেতে খেতে প্যাড থেকে কয়েক ফুট উঠে পড়ল কপ্টার। পাইলটকে দেখতে পেল রানা, সেই সরুমুখো লোকটা—টোচেল্। পাশের সীটে বসে রয়েছে কবীর চৌধুরী! অলৌকিক উপায়ে বা যেভাবেই হোক, এতবড় এক বিস্ফোরণের কেন্দ্রে থেকেও প্রায় অক্ষত অবস্থায় আবারও বেঁচে গেছে লোকটা। অবশ্য পুরো মুখ রক্তাক্ত তার, কপালে তাড়াহুড়োয় বাঁধা একটা ব্যান্ডেজও আছে। ওর সাথে চোখাচোখি হতে দু'চোখ জ্বলে উঠল কবীর চৌধুরীর। বুনো আক্রোশে চিৎকার করে কি সব বলতে লাগল। বারবার হাত তুলে ওকে দেখাচ্ছে।

রাইফেল তুলেই বেলের হাই-টেস্ট ফুয়েল ট্যাঙ্ক সই করে ট্রিগার টেনে দিল রানা। জায়গামত লাগলে আর দেখতে হত না, সব ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না, কারণ ঠিক গুলি করার মুহূর্তে গার্ডরা একযোগে গুলি ছুঁড়তে শুরু করায় বসে পড়তে হয়েছে রানাকে, ফলে কপ্টারের অনেক ওপর দিয়ে চলে গেছে গুলিটা।

শুয়ে পড়ে আরও কয়েকটা গুলি করল ও, কিন্তু কাজ হলো না। দ্রুত, কোনাকুনি উঁচুতে উঠে গেল বেল সাইয়ক্স। রানাও ঝাঁপ দিল, গিয়ে পড়ল প্যারাপেটের ওপাশে। ঢাল বেয়ে গড়িয়ে দিল নিজেকে। এক ধাক্কায় ফুট বিশেক নেমে এল ও, একটা গাছের সাথে আটকে গেল। ঠিক তখনই প্রথম গুলি হলো ওপর থেকে। কাছেই এক পাথরে বাড়ি খেয়ে আগুনের ফুলকি ছোটাল

বুলেটটা, গুঞ্জন তুলে ছুটে গেল অন্ধকারে।

সামলে নিয়ে রানাও গুলি করল এক মুহূর্ত পর, প্যারাপেটে ভিড় করে থাকা অনেকগুলো ছায়ার মধ্যে একটা চিৎকার করে দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ল। তার রাইফেলটা ছিটকে চলে গেল একদিকে। জবাবে একযোগে কম করেও পনেরো বিশজন গার্ড গুলি ছুঁড়তে লাগল ওর ডানে-বাঁয়ে, সামনে। পাথরে, গাছের ডালে-গুঁড়িতে বাড়ি খেয়ে মহা বিপজ্জনক নৃত্য শুরু করে দিল অসংখ্য বুলেট। চোখে ছিটকে ওঠা মাটির গুঁড়ো পড়তে কিছুক্ষণের জন্যে অন্ধ হয়ে গেল রানা, উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল মাটি কামড়ে। প্রতি মুহূর্তে গুলি খাওয়ার আশঙ্কায় দেহের প্রতিটা পেশী শক্ত হয়ে আছে ওর।

প্রথম পশলা গুলিবৃষ্টি থামার পরও বেঁচে আছে দেখে রীতিমত বিস্মিত হলো। ওপরের ছায়াগুলো লক্ষ্য করে আরও কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে পরমুহূর্তে আবার গড়িয়ে দিল নিজেকে। গাছ ছেড়ে ঝোপ, ঝোপ ছেড়ে গাছ ধরে ধরে, এঁকেবেঁকে পিরামিডের পায়ের দিকে রওনা হয়ে গেল।

হাত-পা মাথা আস্ত নিয়েই নিচে পৌঁছল রানা। ছুটল টেম্পল ঘিরে রাখা খোলা জায়গার ওপর দিয়ে। চারদিকে বৃষ্টির মত গুলি পড়ছে, তাই ব্যাকপ্যাক আর ম্যাচেটি তুলে নেয়ার সুযোগ পেল না। এমনিতেও অবশ্য দূরে ছিল ওগুলো। উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে বনে ঢুকে পড়ল রানা, এক মুহূর্তও দেরি না করে বাঁয়ে ঘুরল। টেম্পল থেকে টুংলা নদীতে যাওয়ার ট্র্যাক ধরে ছুটল আবার।

নদীর তীরে একটা ডক আছে, ওটার কাছে ওর জন্যে একটা বোট বাঁধা থাকবে। অন্তত থাকার কথা আছে। হঠাৎ সামনে থেকে একটা গলা ভেসে আসতে আঁতকে উঠে ব্রেক কষল রানা। ঝট্ করে এক পাশে সরে দাঁড়াল।

'কুয়েন এস্?' প্রশ্ন করল কেউ। বড় এক ঝোপের আড়াল থেকে লাফিয়ে ট্র্যাকে এসে উঠল সে। কবীর চৌধুরীর গার্ড

লোকটা—হাতে পিলে চমকানো আকৃতির পুরানো মডেলের এক পিস্তল। রাইফেলে গুলি নেই, তাই রাইফেলটাই তার বুক সই করে সজোরে ছুঁড়ে দিল ও। লোকটাও গুলি করল প্রায় একই সময়ে।

একেবারে মুখের সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও আগুনের ঝলকে মুহূর্তের জন্যে অন্ধ-কালা হয়ে গেল রানা। বাঁ কাঁধে গুলির ধাক্কায় ঘুরে গেল আধ পাক্। ওপরের দিকে, গলার পাশের নরম মাংসের খানিকটা উড়িয়ে নিয়ে গেছে বুলেট। তার মধ্যেও জোরাল একটা শব্দ এবং তার পরপরই গার্ডের কাতর গোঙানি শুনতে পেল। জায়গামতই লেগেছে রাইফেল।

কাঁধের অসহ্য যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে অন্ধের মত ঝাঁপ দিল ও গার্ডের অবস্থান লক্ষ্য করে। একেবারে ষষ্ঠাঙ্গে পড়ল তার ওপর। তখনই দ্বিতীয় গুলি করল গার্ড। মিস্ করল। পরক্ষণে বুকে চেপে বসে ভয়ঙ্কর এক ঘুসিতে ব্যাটার নাকমুখ সমান করে দিল ও। বুকে রাইফেলের আঘাত খেয়ে আগেই খানিকটা কাহিল হয়ে পড়েছিল লোকটা, ঘুসি খেয়ে আরও নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

এক ঝটকায় তার মুঠো থেকে পিস্তল খসিয়ে দিল রানা, একই ওজনের আরও গোটা তিনেক ঘুসি বসিয়ে দিল নাকেমুখে। স্থির হয়ে গেল গার্ড, জ্ঞান হারিয়েছে। উঠল ও, পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে কোমরে গুঁজল, ততক্ষণে রক্তে ভিজে গেছে শার্টের বাঁ দিকের পুরোটা। একহাতে ক্ষতস্থান চেপে ধরে টলোমেলো পায়ে আবার ছুটল ও সরু ট্র্যাক ধরে। দূর থেকে কবীর চৌধুরীর গার্ড বাহিনীর হাঁকডাক কানে আসছে, সেই সাথে গুলির আওয়াজ। আন্দাজে হলেও ট্র্যাক সই করেই গুলি ছুঁড়ছে ওরা, প্রায়ই আশপাশের গাছে এসে বিঁধছে বুলেট।

দাঁতে দাঁত চেপে ছুটতে থাকল রানা। কাঁধ প্রায় অবশ করে দিয়ে একটু একটু করে ওপরদিকে উঠছে এখন ব্যথাটা। চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছে ও। শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে।

তবু থামল না ও, উপায় নেই। গতি কমে এলেও ছুটতেই থাকল। একটু পরপরই হোঁচট খাচ্ছে, মুখ দিয়ে দম নিচ্ছে আর ছাড়ছে। কাঁপা, ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ উঠছে।

পিছনে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দ উঠতে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। কয়েকটা কণ্ঠের আর্ত চিৎকার শুনে মানসিক প্রতিবন্ধীর মত হেসে উঠল শব্দ করে। নিজেদের পাতা বুবি ট্র্যাপের শিকার হয়েছে কিছু গার্ড। ঘুরে আবার পা চালাল ও। শেষের শ'খানেক গজ অনেক কষ্টে অতিক্রম করল। তারপরই এসে পড়ল একটা খোলা জায়গায়। সামনে টুংলা নদীর খল খল শব্দ।

বোটের কথা ভাবতে হারানো শক্তির অনেকটাই ফিরে এল ওর। দুই গার্ড ছিল ডকের কাছে, এবং ওর অপেক্ষাতেই গা ঢাকা দিয়ে ছিল ব্যাটারা। গোলাগুলি আর বিস্ফোরণের শব্দে সতর্ক ছিল। কিন্তু এরা সত্যিকারের ট্রেনিং পাওয়া প্রফেশনাল নয় বলে বিশেষ বেগ পেতে হলো না রানাকে। গার্ড আছে ধরে নিয়েই এগিয়েছিল ও।

প্রথম গার্ডটাকে খুঁজে বের করতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। পিছন থেকে পিস্তলের বাঁট দিয়ে মেরে তার খুলি ইঞ্চিখানেক দাবিয়ে দিল ও। দ্বিতীয় জন বিপদ টের পেয়ে একেবারে শেষ মুহূর্তে নিজের গোপন আস্তানা থেকে কিছুটা সরে গিয়ে ধরা খেল। তার সঠিক অবস্থান জানার জন্যে মুঠোর চেয়ে একটু বড় সাইজের একটা পাথর ছুঁড়ে মেরে ছিল রানা আন্দাজে। ওটা কয়েক ফুট পিছনে ঝুপ করে পড়তেই আঁতকে উঠে গুলি করে বসল লোকটা। পরের গুলি রানা করল, লোকটার এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে গেল সেটা।

জেটিটা নড়বড়ে। পুরানো, অর্ধেক পচা কাঠের। টুংলার বেশ কয়েক গজ ভেতরে গিয়ে শেষ হয়েছে। নদী এখানে সরু ও অগভীর, কাদাটে পানি। দুদিক থেকে গাছের ডালপালা এগিয়ে এসে ওপরে ছাদের মত তৈরি করেছে। তীরে প্রায় হাঁটু সমান

থকথকে কাদা।

জেটির মাথায় দুটো বোট বাঁধা। তার একটার দুই প্রান্ত চোখা, ক্যানোর মত দেখতে। একমাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত একাধিক দাঁড়ি বসার জায়গা আছে ওটায়। অন্যটা ঝকঝকে এক মোটর লঞ্চ। কিন্তু ওগুলোর প্রতি কোন আগ্রহ দেখাল না রানা। বরং দুটোকেই অচল করে রেখে পানিতে নেমে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। জেটি থেকে একশো গজমত ভাটিতে এসে পেয়ে গেল যা খুঁজছিল।

পঁচিশ ফুট লম্বা, সাত ফুট চওড়া একটা মোটর লঞ্চ। ওরই জন্যে রাখা আছে বোটটা। দেখতে এটাও চমৎকার। কেবিন পিছনে, সামনেটা একদম খোলামেলা। ওটাকে ধরে রাখা লাইনগুলো খুলে উঠে পড়ল রানা, এমন সময় খুব কাছেই হাঁকডাকের আওয়াজ উঠল। কবীর চৌধুরীর বাহিনী পৌঁছে গেছে। দুই সঙ্গীকে মৃত আবিষ্কার করে অকথ্য সব খিস্তির তুবড়ি ছোটাচ্ছে।

সন্তুষ্টির হাসি হেসে স্টার্টার বাটন টিপে দিল ও। মৃদু গুঞ্জন তুলে চালু হয়ে গেল এঞ্জিন। থ্রটল দিয়ে দ্রুত বোট ঘুরিয়ে মাঝনদীর দিকে এগোল ও। একটু পর ওর এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেল গার্ডরা, দৌড়ে এসে জেটির মাথায় অবস্থান নিয়ে একযোগে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। কম করেও বিশ-পঁচিশটা রাইফেলের সম্মিলিত হুঙ্কারে কেঁপে উঠল গোটা এলাকা।

ডেকে শুয়ে পড়ল রানা, হুইল ধরে রেখেছে। মাথার ওপর দিয়ে ক্ষিপ্ত বোলতার মত ক্রুদ্ধ গুঞ্জন তুলে ছুটে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট। কেবিনের ছাদে লাগল কয়েকটা, কয়েক জায়গার কাঠের প্যানেলিং চুরমার হয়ে গেল। কেবিনের কাঁচও গুঁড়ো হলো কয়েকটা। বাধ্য হয়ে থ্রটল আরও বাড়াল ও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বিপদ থেকে দূরে সরে যেতে চায়।

অবশেষে একসময় ওদের গুলির রেঞ্জের বাইরে চলে এল

বোট, হাঁপ ছেড়ে উঠে পড়ল রানা। এদিক-সেদিক তাকিয়ে বোটের বড় ধরনের কোন ক্ষতি হয়েছে কি না দেখল। হয়নি। বেশিরভাগ গুলি গেছে ওপর দিয়ে। যেগুলো লেগেছে, তার সবই হয় পুরু লোহার খোলে, অথবা কাঁচে বা প্যানেলিঙে। কাজেই চিন্তার কিছু নেই।

মুখ দিয়ে সশব্দে দম ছেড়ে আকাশের দিকে তাকাল ও, লতাপাতার ফাঁক দিয়ে রাতের নীলচে-সবুজ রঙের আকাশ দেখতে পেল। পানি কালো দেখাচ্ছে। বাতাসে লতাপাতা পচা বিশ্রী দুর্গন্ধ। ঘন ছাতার নিচ দিয়ে দ্রুত ছুটে চলেছে বোট।

পিছনের বিপদ পুরোপুরি কাটতেই কাঁধের ক্ষতটার ব্যাপারে সচেতন হলো রানা। নিজে থেকে নয়, ওটাই জানান দিল। খুব কাছ থেকে গুলিটা খেয়েছে ও পেক্টোরাল মাস্‌লে। বুলেট ঢোকার এবং বেরিয়ে যাওয়ার ছিদ্রটা বিস্ময়কর রকম ছোট, কিন্তু রানার বুঝতে অসুবিধে হলো না খুব দ্রুত কোন ডাক্তারের সাহায্য নিতে হবে ওকে। রক্ত যে হারে পড়ছে ওখান থেকে, তাতে আর বেশিক্ষণ খাড়া থাকা সম্ভব হবে না। উত্তেজনা কেটে যাওয়ায় এখন বেশ দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করেছে।

হ্যান্ডব্যাগটা হাতড়ে বড়সড় এক রুমাল বের করল ও। মিষ্টি সেন্টের গন্ধ বের হচ্ছে ওটা থেকে। ওটা কাঁধে পেঁচিয়ে এক মাথা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে যথাসম্ভব টাইট করে ক্ষতমুখটা বাঁধল রানা। রক্ত পড়ার গতি কমে গেল অনেকটা। ব্যাগের ভেতরের কাগজপত্রগুলোর কথা মনে পড়ল। কিন্তু এখন ওসব চেক করার উপায় নেই, তাই মাথা থেকে চিন্তাটা সরিয়ে দিয়ে বোট চালনায় মন দিল ও।

সময় গড়িয়ে চলেছে। টুংলা ক্রমে প্রশস্ত ও গভীর হচ্ছে। স্রোতের প্রচণ্ড টানে একেক সময় জ্যান্ত হয়ে উঠছে বোট, গা ঝাড়া দিয়ে হাত থেকে ছুটে যেতে চাইছে হুইল। ওটাকে সামাল দিতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে রানার। জোর খাটাতে গেলেই চোখে

সর্ষে ফুল দেখছে। ব্যথায় জ্ঞান হারাবার দশা। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার ক্ষমতা কমে আসছে। কেবিনের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও।

খানিক পর তাও অসম্ভব হয়ে উঠতে বসে পড়ল ধপ্ করে। ভীষণ দুর্বল লাগছে। ঘামে ভিজে উঠেছে কপাল—জ্বর আসছে। কতক্ষণ ধরে চলছে সে হুঁশ হারিয়ে ফেলেছে রানা। এক ঘণ্টা, নাকি দু'ঘণ্টা? পিরামিড থেকে গড়িয়ে নামার সময় পাথরে লেগে রিস্টওয়াচটা ভেঙে গেছে, ছিট্‌কে পড়েছে সব কাঁটা। কাজেই জানার উপায় নেই ক'টা বাজে। কেবিনের দেয়ালে মাথা রেখে ঝিম্ মেরে বসে থাকল রানা, অপস্রিয়মান বনের দিকে তাকিয়ে আছে ঝাপ্‌সা চোখে। দুই তীর থেকেই প্রাণের সাড়া পাচ্ছে, কিন্তু ওগুলো কি, তাকিয়ে দেখার মত আগ্রহ খুঁজে পাচ্ছে না।

নিজেকে শিশুর মত অসহায়, অক্ষম মনে হচ্ছে ওর—মায়ান টেম্পল, কবীর চৌধুরী, টোচেল, সব ঝাপ্‌সা স্মৃতি যেন। কবে গিয়েছিল ও টেম্পলে? কোন যুগে? কোন শতাব্দীতে? কি কথা হয়েছে কবীর চৌধুরীর সাথে? তারপর টোচেল...বারবার ভাবনার খেই হারিয়ে ফেলছে রানা। উঁকি দিয়েই হারিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ওরই মধ্যে একটা ব্যাপার ঠিকই বুঝতে পারছে। আবহাওয়া বদলে যেতে শুরু করেছে, বাতাসের মতিগতি অন্যরকম হয়ে উঠছে। স্বাভাবিক উষ্ণ বাতাস দুরন্ত, শীতল হয়ে উঠছে, দু'তীরের অলস গাছপালার মাথায় চাঁটি মেরে দিশেহারার মত ছুটছে। শূন্যে ডালপালা ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে ওগুলো। জবাবে গোঁ-গোঁ ভয়ঙ্কর হাসি হাসছে বাতাস। বোটও দুলতে শুরু করেছে। গাঢ়, ঘন মেঘের ব্যস্ত ছোটাছুটি চলছে আকাশে। এত নিচে, যেন হাত বাড়ালেই ধরা যাবে।

জোর করে পূর্ণ চোখ মেলে তাকাল রানা। বুঝতে পেরেছে কবীর চৌধুরীর সর্বনাশা কিলিং মেশিনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে আরও বেড়ে গেল বাতাস। বড় বড় গাছগুলোও

আড়মোড়া ভাঙতে শুরু করেছে এবার, দূরে গাছ উপড়ে পড়ার আওয়াজ উঠছে। আহত, ভীত প্রাণীর আর্ত চিৎকার ও ছুটে পালানোর শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও। হঠাৎ করে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে টুংলার দুই তীর। কিছু সময়ের জন্যে থেমে গেল বাতাস, তারপর আরও ভয়ঙ্কর গতিতে বইতে শুরু করল, সম্পূর্ণ উল্টোদিক থেকে। তার তীক্ষ্ণ বাঁশির মত হুঙ্কারে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল রানার। কোন অভিশপ্ত ডাইনীর কান্না যেন ওটা।

কবীর চৌধুরীর ফোর্স ফিল্ড কি জিনিস, এইবার বুঝল ও।

ভীষণ উত্তাল হয়ে উঠেছে নদী। ফসফরাসে আবৃত প্রকাণ্ড ঢেউ উঠছে চতুর্দিকে, এলোমেলো ঢেউ। ওর ছোট বোটটা তার মধ্যে খাবি খাচ্ছে। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করেছে, ধূমকেতুর লেজের মত প্রায় খাড়া, নিচমুখো হয়ে ঝলসে উঠছে। রক্তবর্ণ হয়ে উঠছে আকাশ বজ্রপাত না ঘটা পর্যন্ত।

খানিকপর শুরু হলো বৃষ্টি। প্রথমে কুয়াশার মত, তারপর ঝমঝমিয়ে। এমনভাবে ঝরছে, মনে হলো আকাশে অদৃশ্য কেউ আরেকটা নদী কাত করে ধরে রেখেছে। কেবিনের ভেতরে বাতাসের উন্মত্ত ছোটাছুটির ফলে ঠিকমত দম নিতে পারছে না রানা। বোট নিয়ন্ত্রণে রাখতে হুইল ধরে প্রায় ঝুলে আছে, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। থেকে থেকে বিদ্রোহ করছে সেটা। কিছুক্ষণ পর হাল ছেড়ে দিল ও বাধ্য হয়ে, নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা বাদ দিয়ে কেবল ধরে ঝুলে থাকল, বাতাসে ইচ্ছেমত এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করে বেড়াতে লাগল বোট।

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, সামনে এক ব-দ্বীপ দেখে কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেল রানা। টুংলার মোহনা আর বেশি দূরে নয়। আরেকটু পর প্রিনযাপোলকার মিটমিটে আলো দেখা গেল বাঁয়ে, প্রশস্ত এক ইনলেটের ওপাশে। ডানে উন্মত্ত সাগর ফুঁসছে ভয়ঙ্কর আক্রোশে।

অনেক সংগ্রাম করে বোট নিয়ে হারবারে পৌঁছল ও, এখানে

পানি তুলনামূলকভাবে অনেক শান্ত। কবীর চৌধুরীর নকল ঝড়ের হাত থেকে আপাতত রেহাই পাওয়া গেছে, ব্যাপারটা প্রথমে বিশ্বাসই হতে চাইছিল না। মাঝারি গতিতে তীরের দিকে চলল ও, নির্জন তীরে বোট ঠেকে যেতে ভেঙেচুরে বসে পড়ল।

ঝড়ের প্রথম ঝাপটা ততক্ষণে কেটে গেছে। বাতাস একই গতিতে বইছে, বৃষ্টি পরিণত হয়েছে বরফের কণায়।

আধ ঘণ্টা পর ও যখন টাউন স্কয়ারে পৌঁছল, তখন শুরু হয়ে গেছে তুষারপাত।

আট

প্লাযার চার্চের টাওয়ার ক্লকে মাত্র সাড়ে আটটা বাজে দেখে খুব অবাক হলো রানা। ওর ধারণা ছিল ভোরের আলো ফুটতে বেশি দেরি নেই। অসহ্য শীতে কাঁপতে কাঁপতে এদিক-ওদিক তাকাল। একদম ফাঁকা প্লাযা, মানুষ দূরের কথা, একটা কুকুর-বেড়ালও নেই।

ওর সামনে, প্লাযার তিনদিকে কয়েক ডজন তুষারমোড়া সরু লেন। কিছু চলে গেছে সোজা, কিছু ডানে-বাঁয়ে। পিছনে হারবার। ওখানে জেটিতে বাঁধা আছে প্রিনযাপোলকার বিচিত্র-বর্ণের বিশাল ফিশিং বোটের বহর। তবে এখন কেবলই সাদা ওদিকটা, সব রং ঢাকা পড়ে গেছে তুষারে। মিনিটে মিনিটে তুষারপাতের পরিমাণ বাড়ছে। কয়েক গজের ওপাশে ভালমত দেখা যায় না।

চারদিক তাকিয়ে গা ছমছম করে উঠল ওর। মানুষজন কোথায়? দক্ষিণ আমেরিকার আর সব শহরের মত প্রিনযাপোলকার সিটি স্কয়ারও মাঝরাত পর্যন্ত সরগরম থাকে মানুষের পদভারে। হকার, দোকানি, খদ্দের, পুরান্নো মডেলের গাড়ি, আড্ডাবাজ বুড়োদের জটলা, ভিড়ের মধ্যে দুধের ক্যান বোঝাই দেয়া গাধা, তাজা মাছ-মাংসের দোকান, সবই থাকে।

কিন্তু আজ কিছু নেই, কেউ নেই। একদম ফাঁকা স্কয়ার। কবীর চৌধুরীর কল্যাণে পালিয়েছে সবাই। পরিত্যক্ত, ভুতুড়ে লাগছে জায়গাটাকে। বরফের মত হিম বাতাস বোবা আক্রোশে মাথা কুটছে চারদিকের দালানকোঠায়। কিছুটা এগিয়ে মেইন অ্যাভেনিডায় পৌঁছল রানা। বাঁ দিকের সবুজ ঘাসমোড়া, বড় বড় গাছের ছায়া ঢাকা পার্কটা তুষারের পুরু চাদর গায়ে দিয়ে পড়ে আছে নির্জীবের মত। অথচ অতীত অভিজ্ঞতা থেকে রানা জানে, প্রেমিক-প্রেমিকাদের মিলনমেলা অনেক রাত পর্যন্ত চলে এখানে। চলত। হয়তো গতকালও চলেছে।

একটা বিশেষ ঠিকানা খুঁজছে ও। দশ নম্বর ক্যাল্লে মন্টেনিগ্রো। ডক্টর ফার্নান্দেজের ঠিকানা। দুই কাজে তাকে প্রয়োজন। সিআই-এর লোকাল ইনফর্মার লোকটা, শহরের নামকরা ডাক্তার। বিসিআইয়ের এক মেয়ে এজেন্ট আছে তার ওখানে, নার্সের বেশে। চার-পাঁচ দিন হলো ওই কাজে 'জয়েন' করেছে সে। কাজ শেষ করে দ্রুত কেটে পড়ার জন্যে কারও সাহায্য প্রয়োজন হবে রানার, তাই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার আসল পরিচয় জানে না ডাক্তার, অন্তত বিসিআইয়ের তাই ধারণা। পুরানো নার্স হঠাৎ করে 'অসুস্থ' হয়ে পড়ায় ফার্নান্দেজের কন্ট্রোলার, মানাগুয়ার মার্কিন দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারির 'ভেরিফিকেশন' অনুযায়ী তাকে নিয়োগ করেছে সে।

সিআইএ প্রধান রাহাত খানের অনুরোধে এই বিশেষ আয়োজন করেন। ডাক্তার ফার্নান্দেজের বিশ্বস্ততায় বৃদ্ধের সন্দেহ

ছিল বলে নয়, স্রেফ নিরাপত্তার খাতিরে। এ অঞ্চলের আর সব শহরের চেয়ে আলাদা কিছু নয় প্রিনযাপোলকা। অন্য সব জায়গার মত এখানকারও প্রতি দু'জনের মধ্যে একজনের কাছে বিক্রি করার মত কিছু না কিছু 'সিক্রেট' আছে, এবং প্রতি পাঁচজনের একজনই 'এজেন্ট'।

কিসের বা কার 'এজেন্ট', সেটা অন্য বিষয়। টাকা হাতবদলের মত এদের বিশ্বস্ততাও যখন-তখন বদল হয়। নিয়োগকর্তার চোখের সামনে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ 'এজেন্ট' ঠিক থাকে, আড়াল হওয়ার সুযোগ এলেই গেল। ডক্টর ফার্নান্দেজ এই দলের কি না জানা নেই, তাই এজেন্টটির ব্যাপারে কোনরকম ঝুঁকি নিতে চাননি বৃদ্ধ।

ঘোড়ার ডাক ও পা ঠোকার শব্দে সচকিত হলো ও। রাস্তার বাঁ দিকে শাটার নামানো এক স্টেব্‌ল্ থেকে আসছে আওয়াজ। এরকম আবহাওয়ায় পশুগুলো অনভ্যস্ত, পা ঠুকে শীত তাড়াচ্ছে।

একসময় ঠিকানাটা খুঁজে বের করল রানা। বিল্ডিংটা স্টেব্‌লের কাছেই। চারতলা, মান্ধাতা আমলের। ভেতরে পা রেখে মনে হলো কোন দৈত্যাকার কোল্ড স্টোরেজে ঢুকে পড়েছে বুঝি ভুল করে। শিউরে উঠল রানা। কোন ফ্লোরে ডাক্তারের চেম্বার, জানা ছিল, কাজেই কোনদিক না তাকিয়ে তিনতলায় উঠে এল ও।

সামনে থেকে দেখতে যাই হোক, বেশ লম্বা বিল্ডিংটা। করিডরের শেষ মাথায় ডাক্তারের চেম্বার। নির্দিষ্ট রুমের আগেরটায় টেনেন্ট নেই। দরজাও লাগানো নেই, হাঁ হয়ে আছে। শূন্য, অন্ধকার। ডাক্তারের বন্ধ দরজায় নক্ করার জন্যে হাত তুলেও শেষ মুহূর্তে থেমে গেল ও, কিছু ভাবল চোখ কুঁচকে। পিছিয়ে এসে কাঁধের ব্যাগটা অন্ধকার রুমে রেখে দরজাটা লাগিয়ে দিল নিঃশব্দে। তারপর নক্ করল। রানা ভেবেছিল 'নার্স' দরজা খুলবে, কিন্তু না, খুলল প্রায় মাঝবয়সী, ছোটখাট এক লোক।

সাদা শার্টের ওপর নীল সোয়েটার গায়ে দিয়ে আছে লোকটা। শার্টের কলার ওপরে তোলা। পরনে ফ্যাকাসে নীল ট্রাউজার্স। মুখটা ডিমের মত, ছাই রঙের। মুখ থেকে দেশী মদের গন্ধ বের হচ্ছে। 'সি?' বলল সে।

'ডক্টর ফার্নান্দেজ?'

'সি!'

তার মাথার ওপর দিয়ে ভেতরে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল ও, কিন্তু কোন নার্সকে দেখতে পেল না। কোথায় সে? 'ইয়ে, মাছ ধরতে গিয়ে একটা দুর্ঘটনা...ভেতরে আসতে পারি?' অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করল না ও, লোকটাকে প্রায় ঠেলে ঢুকে পড়ল। ওর কাঁধের রক্তাক্ত রুমালটার দিকে তাকিয়ে থাকল ফার্নান্দেজ। রানা খুঁজছে 'নার্সকে'—নেই সে।

'কি চান আপনি, সেনিয়র?'

চোখ গরম করে তাকাল রানা। কাঁধ দেখাল ইঙ্গিতে। 'এটা দেখেও বুঝতে সমস্যা হচ্ছে আপনার?'

'কি হয়েছে ওখানে?' তেমন গরজ দেখাল না লোকটা।

'বললাম তো, রড ঢুকে গেছে।'

'আহ্!' মাথা দোলাল ডাক্তার।

'আমার এক বান্ধবী কাজ করত আপনার এখানে,' বলল ও। 'মারিয়া। ওকে দেখছি না!'

লোকটার ছোট ছোট দু'চোখে কিসের যেন ছায়া খেলে গেল। ব্যাপারটা খেয়াল করল রানা, কিন্তু আমল দিল না। ভাবল, ভুল দেখেছে। মনের যা অবস্থা, তাতে সেটা খুবই স্বাভাবিক।

'মারিয়া! আপনি ওর বন্ধু?' হঠাৎ করে ব্যস্ত হয়ে উঠল ফার্নান্দেজ। 'তা আগে বলবেন তো!' প্যান্টের পকেট থেকে প্রকাণ্ড এক ব্যানডানা বের করে কপাল-ঠোঁট মুছল। আসুন, আসুন। এখানে বসুন, সেনিয়র।'

রুমের এক প্রান্তে পিঠ খাড়া একটা চেয়ারের দিকে এগোল রানা। 'কোথায় গেছে ও?'

'মারিয়া? ডিনার খেতে গেছে,' ডাক্তার বলল। 'আজ একটা জরুরী অপারেশন আছে কি না! ফিরতে রাত হবে। তাই খেতে গেছে। আপনি বসুন, এই ফাঁকে আমি আপনার কাঁধে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছি।'

বিশ্রী একটা সন্দেহ উঁকি দিল রানার মনে। কিন্তু চুপ করে বসে থাকল। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ক্ষতটা, আগে ওটার ব্যবস্থা করাতে হবে, তারপর আর সব। এটা না হলে কিছুই করা সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। বসে বসে চারদিকে নজর বোলাতে লাগল রানা। রুমটা বেশ বড়, মাঝখানে এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত লম্বা পর্দা। এ মুহূর্তে অবশ্য একদিকে টেনে রাখা আছে ওটা।

প্রথম অর্ধেকে আছে কয়েকটা চেয়ার এবং একটা সোফা। পরের অর্ধেকে আছে একটা মেহগনি কাঠের ডেস্ক, মেডিসিন কেবিনেট, যন্ত্রপাতির র‍্যাক, ও যে চেয়ারে বসে আছে সেটা। ডেস্কে একটা গূজনেক ল্যাম্প জ্বলছে।

এদিকে ফার্নান্দেজ ওর কাঁধের রুমাল খুলে ক্ষত পরীক্ষা করছে তীক্ষ্ণ চোখে। কাজ শেষ হতে মাথা দোলাল সে। 'হুঁম! আপনার ভাগ্য ভাল, সেনিয়র। কোন হাড় ভাঙেনি, কোন মেজর ব্লাড ভেসেলও ছেঁড়েনি। স্রেফ নিখুঁত একটা ফুটো...কিভাবে ঘটেছে যেন ব্যাপারটা?'

'রড ঢুকে,' বলল ও।

'ই! জং ধরা ছিল না তো ওটা?'

'না।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

'হোয়াট?'

'কিছু না।' ঘুরে দাঁড়াল ফার্নান্দেজ। কেবিনেট খুলে ছোট এক শিশি ডিজইনফেক্ট্যান্ট বের করল। 'এই আছে আমার কাছে,

সেনিয়র। পেনিসিলিন নেই এ মুহূর্তে। তবে চিন্তা করবেন না। আপনার ক্ষত এতেই সেরে যাবে, যদি রুমালটা নোংরা না হয়। ইনফেকশনের ভয় নেই।'

মাথা দোলাল রানা, পরমুহূর্তে চেয়ারের দুই হাতল শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরল নিজেকে স্থির রাখতে। পানি ছাড়া র ওষুধটা ক্ষতস্থানের ভেতরে ঢুকল ঠিক যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মত। জার্ম তো বটেই, অসহ্য যন্ত্রণায় রানার নিজেরই নিকেশ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। হাতল ধরে না রাখলে রকেটের গতিতে উড়েই যেত হয়তো। চিৎকার ঠেকানোর জন্যে জানপ্রাণ দিয়ে লড়ল রানা। তরল ওষুধটা শুকিয়ে আসতে ওখানে খানিকটা বিসমুথ-জুডোফর্ম ঢেলে ক্ষত ব্যান্ডেজ করে দিল ফার্নান্দেজ।

দুটো ট্যাবলেট আর খানিকটা পানি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'পেইনকিলার, খেয়ে নিন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন ওখানে,' সোফাটা দেখাল। 'ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিতে পারলে ভাল হয়, ক্ষত জোড়া লেগে যাবে। নাড়াচাড়া পড়লে ক্ষতমুখ খুলে যেতে পারে আবার।'

'ধন্যবাদ, ডক।'' শুধু পানিটুকুই খেল ও। বড়ি দুটো সুকৌশলে মুঠোতেই রেখে দিল। টের পেল না ফার্নান্দেজ। 'তাহলে বরং একটু ঘুমিয়েই নিই। আমার বান্ধবী ফিরলে ডেকে দেবেন দয়া করে।'

'ই! নিশ্চই, আপনি রেস্ট নিন, সেনিয়র।'

সোফায় এসে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। বিস্মিত হলো কাঁধের ব্যথা এরইমধ্যে অর্ধেক নেই হয়ে গেছে দেখে। নরম সোফায় পিঠ ছোঁয়ানোর দু'মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল ও। ডেস্কের পিছনে বসে মিনিট পাঁচেক কাজের ভান করল ফার্নান্দেজ, কান রানার দিকে। ও গভীর দম নিচ্ছে দেখে চোখ তুলে তাকাল। একটু একটু নাকও ডাকছে।

কপাল কুঁচকে উঠল ফার্নান্দেজের, কিছু ভাবছে। আরও পাঁচ

মিনিট অপেক্ষা করল সে, তারপর নিঃশব্দে উঠে পড়ল। পা টিপে টিপে এগোল দরজার দিকে, নজর রানার ওপর। একটুও শব্দ না করে বেরিয়ে গেল, তার আগে দরজাটা টেনে দিতে ভুলল না। মৃদু ক্লিক্! শব্দটা কানে যাওয়ামাত্র চোখ মেলল রানা–ঘুমের লেশমাত্র নেই চেহারায়।

উঠে এসে দরজাটা চুল পরিমাণ ফাঁক করল ও, সেখানটায় চোখ রেখে বাইরে তাকাল। ডাক্তারের পিছনদিক দেখা যাচ্ছে। দ্রুত, কিন্তু বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে। টেলিফোন করতে? কাকে? এবার আর সন্দেহ নয়, লোকটার ব্যাপারে নিশ্চিত হলো রানা। একই সঙ্গে ওর সাহায্যকারীর কথা ভেবে উদ্বিগ্নও হলো। কোথায় সে? কি ভাবে ফাঁস হলো ওদের কভার?

ফার্নান্দেজ চোখের আড়ালে চলে যেতে চট্ করে বেরিয়ে এল ও। দরজা লাগিয়ে পাশের অন্ধকার রুমটায় ঢুকে পড়ল দ্রুত। মেঝে হাতড়ে ব্যাগটা তুলে নিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে অপেক্ষায় থাকল ডাক্তারের। শুধু তারই নয়, ওর দৃঢ় বিশ্বাস সঙ্গে আরও কেউ নিশ্চয়ই থাকবে। দরজা সামান্য ফাঁক করে তাকিয়ে আছে ও, সময় গড়িয়ে চলেছে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, তিন মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল ডাক্তার, একা। আগের মতই নিঃশব্দ পায়ে, দ্রুত ওকে পেরিয়ে গেল। পাশের রুমের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল না রানা, তবে ডাক্তারের সশব্দে আঁতকে ওঠার শব্দ ঠিকই কানে এল। ভেতরে ঢোকেনি ব্যাটা, দরজা খুলে সোফা খালি দেখেই এক লাফে করিডরে এসে দাঁড়াল। দেখেই বোঝা যায় এতবড় বিস্ময়ের মুখোমুখি আজই প্রথম হয়েছে সে।

বেকুবের মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কপাল ঘামছে। হঠাৎ ও যে রুমে আছে, সেটার দিকে তাকাল চোখ কুঁচকে। কয়েক পা এগিয়ে এসে ভেতরে কোন আওয়াজ হয় কি না শোনার জন্যে

কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকল মূর্তির মত। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকল রানাও, মাত্র তিন হাত দূরে দাঁড়ানো ফার্নান্দেজকে দেখছে। ঘন ঘন দম ছাড়ছে লোকটা, এত শীতেও ঘামে কপাল পুরো ভিজে উঠেছে। মনে হচ্ছে এই মাত্র একশো মিটার স্প্রিন্ট দিয়ে এসেছে বুঝি।

কিছু দেখতে পায়নি, পাওয়ার কথাও নয় অন্ধকারে, তবু তার চেহারা দেখে রানার মনে হলো এই রুমটাকেই ওর আত্মগোপনের জায়গা হিসেবে সন্দেহ করছে ব্যাটা। এগিয়ে আসতে গিয়েও থেমে গেল ফার্নান্দেজ, দ্রুত পায়ে নিজের রুমে চলে গেল। অবশ্য এক মিনিট পার হওয়ার আগেই আবার উদয় হলো—হাতে শোভা পাচ্ছে একটা ম্যাকারভ পিএম। নীরবে মাথা নেড়ে আফসোস প্রকাশ করল রানা। এইসব অ্যামেচারদের রিক্রুট করে বলেই পদে পদে সমস্যায় পড়ে সিআইএ।

ডাক্তারকে এগিয়ে আসতে দেখে দরজার কাছ থেকে সরে গেল কয়েক পা। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে অনড় দাঁড়িয়ে থাকল। ব্যাটার নাকে ডিজইনফেক্ট্যান্টের কড়া গন্ধ যাওয়ার চান্স আছে, ভাবছে ও। অবশ্য এ রুমেও গন্ধের অভাব নেই। কড়া ভার্নিশের গন্ধ ছাড়াও তারপিনের গন্ধ আছে। হয়তো...

আস্তে করে দরজা খুলে ফেলল ফার্নান্দেজ। পিএম বাগিয়ে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল, তেরছাভাবে তাকিয়ে আছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আরও দু'পা পিছাল রানা। বসে পড়ল। এখনই কিছু করে বসার ইচ্ছে নেই। আগে নিশ্চিত হয়ে নিতে চায় কি করতে চাইছে ব্যাটা, কাউকে খবর দিতেই নিচে গিয়েছিল কি না ইত্যাদি।

ভেতরে ঢুকল না সে, বোধহয় সাহসে কুলোয়নি। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে খানিক উঁকিঝুঁকি মেরে পিছিয়ে গেল দরজা খোলা রেখেই। শ্রাগ করল রানা, থাকুক খোলা। তাতে ওর কোন সমস্যা নেই। ভাবতে না ভাবতেই সিঁড়ির দিক থেকে দু'জোড়া

ভারী পায়ের শব্দ কানে আসতে সতর্ক হয়ে উঠল। নজর ডাক্তারের ওপর। হাঁ করে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে আছে সে। এতবড় হাঁ যে আস্ত ডিম ঢুকে যাবে মুখের মধ্যে।

ডাক্তারকে খোলা জায়গায় অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হয়তো কিছু সন্দেহ হলো আগন্তুকদের, পায়ের শব্দ দ্রুততর হলো। কয়েক মুহূর্ত পর দেখা দিল ওভারকোট পরা খবিস চেহারার দুই মেসতিজো। নোংরার হদ্দ একেকজন। যেমন চেহারায়, তেমনি কাপড়-চোপড়ে। একজন মাঝারি উচ্চতার, অন্যজন মোটামুটি লম্বা। 'কি হয়েছে?' পরেরজন প্রশ্ন করল।

'লোকটা কোথায়?' খাটো খবিস বলল।

'নেই,' বলে ঠোঁট চাটল ডাক্তার।

'নেই!' প্রথমজন রেগে উঠল। 'নেই মানে?' গলা চড়ে গেছে। 'কোথায় গেছে?'

'আমি...আমি জানি না!' রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে লোকটা। আবার ঘামতে শুরু করেছে। 'কসম, কিচ্ছু জানি না। ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে ফোন করতে গেলাম, এসে দেখি সে নেই। সোফা খালি।'

প্রচণ্ড এক ধমক লাগাল লম্বা খবিস। 'ইয়ার্কি হচ্ছে? তুমি জানো ও ব্যাটার ব্যাপারে বস্ কি বলেছেন?'

'ই! কিন্তু ও বেশিদূর যেতে পারেনি, সেনিয়র। যা অবস্থা, তাতে ওর পক্ষে বেশিদূর যাওয়া অসম্ভব।'

'ব্যাটা পালাল কেন?' খাটোজন বলল। 'এমন কি করেছ তুমি যাতে ওর সন্দেহ হয়েছে?'

'না না, আমি আবার কি করব?' ব্যস্ত হয়ে বলল ডাক্তার। 'আমি তো ওকে...'

'নিশ্চই কিছু করেছ তুমি!' খেঁকিয়ে উঠল লম্বাজন। 'শালা, বানচোত্! শুধু শুধু কেন পালাবে লোকটা?'

গাল খেয়ে আঁতে ঘা লাগল বোধহয় ফার্নান্দেজের। খেপে

উঠল। 'দেখুন, মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন আপনারা। ভুলে যাবেন না আমি...'

'চোপ্!' হুঙ্কার ছাড়ল লোকটা, কলার ধরে ঝাঁকি মারতে মারতে রুমে নিয়ে গেল তাকে। কিছুক্ষণ উত্তেজিত তর্কাতর্কি শুনল রানা, তারপরই ধুম্! এবং চেয়ার ভাঙার মড়াৎ!

কিছুক্ষণ চুপচাপ। 'মরে গেল নাকি?' একজন বলল।

'যাক্‌গে!' অন্যজনের জবাব। 'একটা ঘুসি সহ্য করার ক্ষমতা না থাকলে মরে যাওয়াই উচিত ব্যাটার। আমি ভাবছি সেনিয়র টোচেলকে কি বলব।'

'আমি বলে দিচ্ছি কি বলতে হবে।'

দরজার দিক থেকে আসা ভরাট গলাটা শুনে পাঁই করে ঘুরল দুই খবিস। কলজে হিম করা সাইজের পিস্তল হাতে ওখানে রানাকে দেখতে পেয়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল দুটোরই। ওদের অবস্থা দেখে হাসল রানা। সোফার সামনেই একটা ভাঙা চেয়ারের ওপর ডাক্তারকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখল। নাকমুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে লোকটার।

'বলবে, ফার্নান্দেজকে তোমরা সমান করেছ, আর আমি তোমাদেরকে সমান করেছি। ওকে?'

'তুমি?' লম্বা খবিস বলল। 'তুমি কে?'

'সে কি! যাকে খুঁজছ, তাকে দেখেও...'

'ও! তুমি...'

'হ্যাঁ-অ্যাঁ! এই তো চিনেছ, আমিই সেই।' হাসল আবার। অস্ত্রটা উঁচু করল একটু। 'ওভারকোটের পকেট খালাস করো। একজন একজন করে, খুব সাবধানে। অপ্রয়োজনে একটা পেশীও যদি নড়ে, সঙ্গে সঙ্গে গুলি খেতে হবে।'

'সেনিয়র!' খাটো লোকটা বলল। 'আপনার নিশ্চই কোন ভুল হচ্ছে।'

'হক্ কথা,' বলেই গুলি করল ও। খাটোকে নয়, লম্বাকে। ওর নজর সঙ্গীর ওপর দেখে চান্স নিতে গিয়েছিল লোকটা, ওভারকোটের পকেট থেকে অস্ত্র বের করেই নিতম্বের পাশ থেকে গুলি করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার চেয়ে রানা অন্তত দশগুণ ফাস্ট। কাজেই বেকার গেল লোকটার চেষ্টা। উল্টে বুকের ঠিক মাঝখানে গুলি খেয়ে দ্রুত কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে, বিস্মিত চোখ জোড়া দাঁড়ানো অবস্থায়ই উল্টে গেল। ধড়াশ্ করে পিছনদিকে আছড়ে পড়ল। হাতের পিস্তল উড়ে গেছে।

গুলির বিকট শব্দে ভয়ে চিৎকার করে উঠল খাটো খবিস, চোখের সামনে সঙ্গীকে লাশ হয়ে আছড়ে পড়তে দেখে কাঁপতে শুরু করল থরথর করে। নিজের অস্ত্র কোথায় রাখবে দিশে করতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত মেঝেতে রাখল ওটা। সিধে হয়ে এমনভাবে তাকিয়ে থাকল, যেন ধমক দিলেই কেঁদে ফেলবে।

'হক্ কথা বলেছ তুমি,' যেন সব ঠিকঠাক, মাঝে কোন বাধা পড়েনি, এমন ভাবে আবার শুরু করল রানা। 'ভুলই হয়েছে আমার। নইলে এমন ভয়াবহ দুর্যোগের রাতে একটা কুকুর বেড়ালও যে শহরে নেই, সে শহরের সবচেয়ে নামকরা ডাক্তারের অফিস খোলা দেখেও কেন সন্দেহ হলো না? কেন একবারও ভাবলাম না আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে সে? আরও কেউ আছে তার টেলিফোনের অপেক্ষায়?

'সে যাক্। এখন মন দিয়ে শোনো। অহেতুক খুনোখুনি পছন্দ করি না আমি। আর এ মুহূর্তে আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ, তাই কোন ঝুঁকিও নিতে চাই না। সরাসরি প্রশ্ন করছি, উত্তরটাও সোজাসুজি চাই। মেয়েটা কোথায়?'

ঢোক গিলল খাটো। 'মেয়েটা, মানে...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' মাথা ঝাঁকাল ও। 'মেয়েটা মানে মারিয়া। এখানকার নার্স। কোথায় রাখা হয়েছে ওকে?'

জবাব নেই।

তার হাঁটু সই করে পিস্তল তুলল রানা। 'পা খোয়াবার ঝুঁকি

নিতে চাও?' তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, দেখেই বোঝা যায় নিজের সাথে লড়াই করছে লোকটা। বলতে চায়, কিন্তু ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। পিস্তল আরও এক চুল তুলল রানা, ওর চেহারার দৃঢ়তা দেখে শেষ পর্যন্ত হার মানল মেসতিজো।

'বলছি, বলছি!' চেঁচিয়ে উঠল।

'বলো।'

'ক্যা-ক্যাল্লে নোভিওতে রাখা হয়েছে ওকে,' মুখের ঘাম মুছল সে।

'কোথায় সেটা?'

'পরের স্ট্রীট, সেনিয়র। ওটাই নোভিও। এই বিল্ডিং থেকে বেরোলে হাতের ডানে পড়বে।'

'ওখানে কোথায়?' বলল রানা।

'হাতের ডানদিকের তিন নম্বর বাড়িতে। নিচতলায়।'

'কতজন পাহারা দিচ্ছে ওকে?'

'শুধু একজন, সেনিয়র। এক বুড়ি। হাত-পা বেঁধে...'

'ওকে কেন বন্দী করা হয়েছে?'

'তা জানি না, সেনিয়র। ডাক্তার জানে,' অজ্ঞান ফার্নান্দেজকে দেখাল লোকটা। 'ও ফোন করেছিল মিগুয়েলকে।'

'মিগুয়েল কে?' প্রশ্ন কলল রানা।

চোখ ঘুরিয়ে মৃত সঙ্গীকে দেখল খাটো। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ও মিগুয়েল।'

'তারপর?'

'ডাক্তারের ফোন পেয়ে আমরা দু'জন এসে নিয়ে যাই মেয়েটাকে।'

'কবে?'

'আজই। ঘণ্টা তিনেক আগে।'

একটু ভাবল রানা। 'কোর্টেজ আর টোচেল আসছে আমাদেরকে পাকড়াও করতে?'

'হ্যাঁ,' একটু ইতস্তত করে বলল লোকটা।

'কিন্তু ওদের তো আরও আগেই এসে পড়ার কথা ছিল।'

'হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনে গোলমাল দেখা দেয়ায় দেরি হয়ে গেছে।'

মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রানা। ভাগ্যিস গোলমাল দেখা দিয়েছিল, নইলে সর্বনাশের কিছু বাকি থাকত না। 'আমার এখানে আসার খবর জানানো হয়েছে ওদেরকে?'

ঢোক গিলল খাটো। 'হ্যাঁ।'

'কতক্ষণ লাগবে ওদের পৌঁছতে?' মাথা ঝাঁকাল ও।

'ঠিক জানি না, সেনিয়র। এক-দেড় ঘণ্টা লাগতে পারে।'

যথেষ্ট হয়েছে, রানা ভাবল। 'ঠিক আছে। ডাক্তারকে বাঁধো ভাল করে। তোমার কাজ চেক করে দেখব আমি মনে রেখো।'

রুমের মাঝখানে পর্দা টাঙানোর নাইলনের রশি ছাড়া আর কোন রশি নেই দেখে ওটাই কেটে নামাল লোকটা। মাঝখান থেকে কেটে অর্ধেক করে আচ্ছামত কষে বাঁধল ফার্নান্দেজকে। টেনেটুনে দেখে সন্তুষ্ট হলো রানা, বাকি অর্ধেক তুলে নিয়ে পিস্তল দোলাল খবিসের উদ্দেশে। 'ওভারকোট খুলে ফেলো।'

তাকিয়ে থাকল লোকটা—বুঝতে পারেনি।

'বলছি ওভারকোট খোলো।'

খানিক ইতস্তত করে নির্দেশ পালন করল লোকটা, মেঝেতে ফেলে দিল ওটা। সঙ্গে সঙ্গে নতুন নির্দেশ। 'ঘুরে দাঁড়াও।'

ভয় পেয়ে গেল খাটো। 'সেনিয়র!'

'ভয়ের কিছু নেই,' বলল ও। 'ইচ্ছে করলে তোমাকেও মিগুয়েলের মত আগেই খতম করে দিতে পারতাম। কিন্তু বলেছি তো, অনর্থক খুনখারাবি পছন্দ করি না আমি। ঘোরো।'

ঘুরল লোকটা, তবে যথেষ্ট ভয়ে ভয়ে। তার ওপর সতর্ক নজর রেখে দড়িতে খুব সহজ এক ফাঁস পরাল রানা, ঘাড়ে অস্ত্র ঠেসে ধরে দু'হাত পিছনে এনে তার মধ্যে ভরতে বাধ্য করল

তাকে। এরপর ফাঁসটা কনুই পর্যন্ত তুলে টান মারল দড়িতে। এঁটে বসল ফাঁস, এক চুল বাড়তি হাত নাড়ার উপায় রইল না ব্যাটার। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ফাঁসের ওপর একটা গিঁটও দিল ও, তারপর তার ওভারকোটটা তুলে নিজে গায়ে দিল।

'চলো এবার,' দড়ির মাথা ধরে টান মারল।

'কোথায়, সেনিয়র?'

'ক্যাল্লে নোভিও। সেনিয়রিটার কাছে নিয়ে যাবে আমাকে।'

'কিন্তু এই শীতে কোট ছাড়া বের হব কি করে?'

'সে কি!' বিস্মিত হওয়ার ভান করল রানা। 'তোমাদের বস্ এত মাথা খাটিয়ে এই শীত আবিষ্কার করল, আর তুমি কি না বলছ এই কথা? কোর্টেজকে চেনো না তো! এই কথা যদি তার কানে যায়, তোমার মাথা গুঁড়ো করে দেবে। চলো, চলো!'

ডাক্তারের দিকে শেষবারের মত তাকাল ও। এখনও জ্ঞান ফেরার লক্ষণ নেই ব্যাটার। নাকমুখের রক্ত জমাট বেঁধে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা। মেঝে থেকে তার ও দুই খবিসের অস্ত্র তুলে ওভারকোটের পকেটে ভরল ও। পরের দুটো পয়েন্ট টু টু অটোম্যাটিক। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন।

লোকটাকে সামনে নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। বাইরে পা রেখেই হি হি করে কাঁপতে লাগল খবিস, কিন্তু ওর হাতের পিস্তলের ভয়ে কিছু বলতে সাহস পেল না। নিরাপদেই নোভিওতে পৌঁছল রানা, পথে কোন মানুষের ছায়ারও দেখা পাওয়া গেল না। অস্বাভাবিক শীতের ভয়ে বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে নিজেদেরকে আটকে রেখেছে সবাই। এসব কি ঘটছে, তাই নিয়ে গবেষণা করছে হয়তো।

এর মধ্যে তুষারপাতের পরিমাণ আরও বেড়েছে। প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত উঁচু নরম তুষারে ঢাকা পড়ে গেছে রাস্তা। তার ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে ওর মনে হলো, এসব কি সত্যি? নাকি স্বপ্ন দেখছে ও? এ দেশটা আসলেই নিকারাগুয়া? অসলো বা

হেলসিঙ্কি নয়তো?

নির্দিষ্ট বাড়িটার সামনে থেমে পড়ল লোকটা। প্রচণ্ড শীতে দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেয়ে ঠক্ ঠক্ আওয়াজ উঠছে। 'এই বাড়ি, সেনিয়র,' কোনমতে বলল সে। 'নিচতলার অ্যাপার্টমেন্টো।'

মুখ তুলে বাড়িটা দেখল ও। চারতলা বাড়ি, অন্ধকার। মানুষজন সব ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো। সামনের গেট খোলা। এক পাল্লার গেট, প্লেন শীটের। মৃদু বাতাসে সামনে পিছনে করছে। 'ওকে,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ইউ অ্যাডভান্সো!'

মুখ ঘুরিয়ে দূরাগত স্ট্রীট ল্যাম্পের আলোয় ওকে দেখল লোকটা। ঢুকে পড়ল খোলা গেট দিয়ে। সামনের খোলা বারান্দায় উঠে পিছন ফিরে বন্ধ দরজায় নক্ করল। রানা এগিয়ে এসে তার পাশে দাঁড়াল, চাপা গলায় হুমকি দিল, 'মুখ দিয়ে একটা বেলাইনের শব্দ বের হলে খতম হয়ে যাবে।'

পাত্তা দিল না লোকটা, হয়তো শুনতেই পায়নি। আবার নক করল। দ্রুত, অধৈর্য হাতে।

'কে?' একটা চাপা নারীকণ্ঠ প্রশ্ন করল ভেতর থেকে।

'ওরদায। দরজা খোলো।'

'আর কে?'

'তোর ভাতার!' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'খোল্, বুড়ি!'

ছিটকিনি খোলার শব্দ হলো। পরমুহূর্তে যা ঘটল, তার জন্যে ওরদায তো নয়ই, এমনকি রানাও একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। দড়াম করে খুলে গেল দরজা, পরক্ষণে বুকে ফ্লাইং কিক্ খেয়ে উড়ে গেল ওরদায, সাত-আট হাত পিছনে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল বেকায়দা ভঙ্গিতে। ব্যাপার ঠিকমত বুঝে ওঠার আগেই একটা ছায়া সাঁৎ করে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে, ডান হাতের কব্জিতে ভয়ঙ্কর এক জুডো চপ পড়তে পিস্তলটা খোয়াল রানা।

পরমুহূর্তে দুটো হাত ওর ওভারকোটের কলার চেপে ধরল, কাত হয়ে গেল ছায়াটা, হিপ থ্রো করে ওকে আছাড় মারতে

যাচ্ছে। তখনই বহু পরিচিত মিষ্টি গন্ধটা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'করো কি, সোহানা! মরে যাব তো!'

জমে গেল কাঠামোটা। 'রানা!' কণ্ঠে পরিষ্কার অবিশ্বাস।

'হ্যাঁ, আমি।'

'ওই লোকটা...'

'মরাকে মেরেছ। ভয় নেই; ওর হাত বাঁধা আছে।'

নয়

ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সোহানা। 'ওহ্, রানা! আমি ভেবেছিলাম ওরা তোমাকে...ওরা তোমাকে...'

'উহ্, লাগছে! ছাড়ো!'

চট্ করে পিছিয়ে গেল ও। 'সরি। কি হয়েছে?'

'যা হয়, চোট লেগেছে। এখনই সরে পড়তে হবে আমাদের, সোহানা। কবীর চৌধুরী যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে।'

'ও সত্যিই এখনও বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ। খতম করতে পারেনি।'

চোখ বড় করে ওর পিছনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল সোহানা। 'তুষার! কি হয়েছে, রানা?'

'যেতে যেতে বলব সব। দাঁড়াও, এ ব্যাটাকে আগে ভেতরে রেখে আসি। এখানে থাকলে মরবে। তোমাকে এক বুড়ি গার্ড দিচ্ছিল শুনলাম। সে কোথায়?'

'বাথরুমে ঘুমাচ্ছে।'

'বুঝলাম। এসো, সাহায্য করো আমাকে।'

দু'জনে মিলে টেনে হিঁচড়ে বারান্দায় তুলে আনল ওরদাযকে। ঠেলে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। 'যাও,' রানা বলল। 'বের হতে চাইলে বুঝেশুনে হয়ো। এবার গুলি করতে দ্বিধা করব না আমি।'

'এর সঙ্গেরটা কোথায়?' জানতে চাইল সোহানা।

হাত তুলে সিলিং দেখাল ও। 'ওপরে।' একটুপর বলল, 'তুমি জানতে আমি আসছি?'

'হ্যাঁ,' মাথা নাড়ল সোহানা। 'জানতাম। কেন?'

'না, এমনিই জিজ্ঞেস করলাম।' সোহেলের উদ্দেশে মনে মনে বলল, শা-লা!

দরজা টেনে দিয়ে পথে এসে নামল ওরা দু'জন। হাত ধরাধরি করে দ্রুত পা চালাল ক্যাল্লে মন্টেনিগ্রোর উদ্দেশে। 'তোমার প্লেন কোথায়?' রানা প্রশ্ন করল।

'উত্তরের বীচে,' মুখ তুলে দিক নির্দেশ করল সোহানা। রানার ভুরু কুঁচকে উঠেছে দেখে দ্রুত যোগ করল, 'ভয় নেই। মজবুত করে বেঁধে রাখা আছে।'

'বীচে পার্ক করা?' হতাশ দেখাল ওকে। 'কি প্লেন ওটা?'

'সেসনা ওয়ান ফিফ্‌টি।'

'এখানে ওটা ওড়াতে কোন সমস্যা হবে না, সোহানা। কিন্তু ক্যারিবিয়ানের ওপর...'

'ক্যারিবিয়ানে কেন, আমরা মেক্সিকো যাচ্ছি না?'

'না,' দ্রুত মাথা নাড়ল ও। 'এখনই মেক্সিকো যাচ্ছি না।'

'কেন?'

খুব সংক্ষেপে মায়ান টেম্পলের ঘটনা বলল রানা। তারপর বলল, 'এখন বাকি তিনটে ট্রান্সমিটার ধ্বংস করতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'কোথায় আছে ওগুলো?' উদ্বেগ ফুটল সোহানার কণ্ঠে।

মাথা নাড়ল ও। 'জানি না। তবে জানার একটা উপায় মনে

হয় আছে। চলো।'

পা বাড়াল সোহানা। 'ঠিক আছে, ক্যারিবিয়ান কেন, ওই প্লেন নিয়ে জাহান্নামে যেতেও প্রস্তুত আছি। তুমি জানো না আমি কত ওস্তাদ পাইলট হয়ে উঠেছি।'

'তাই নাকি? ব্বাব্বা!' মুচকে হাসল রানা। 'চলো তাহলে।'

জিনস্ আর শার্ট পরে আছে সোহানা, তার ওপর চামড়ার জ্যাকেট। কিন্তু তাতে শীত মানছে না বলে এক হাতে রানাকে জড়িয়ে ধরে হাঁটছে। ওভারকোটের বাঁদিকের ফ্ল্যাপ দিয়ে রানাও যতটা সম্ভব ওকে ঢেকে রেখেছে। তার আগে অবশ্য ক্ষত সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছে। ডান হাত মুক্ত রেখেছে প্রয়োজন পড়তে পারে বলে।

'কাঁধে গুলি খেয়েছ, না?' কিছুদূর এগিয়ে নরম গলায় প্রশ্ন করল সোহানা।

'তুমি জানলে কি করে?'

'ফার্নান্দেজ টেলিফোন করে মিগুয়েলকে এরকমই কিছু একটা বলছিল। বাকিটা আমি আন্দাজ করে নিয়েছি।'

'তারপর?'

'মিগুয়েল আর ওরদায় বেরিয়ে যাওয়ার পর ঠিক করলাম পালাব। ওদের হাত থেকে মুক্ত করব তোমাকে। কিন্তু এত শক্ত করে বেঁধেছিল ব্যাটারা, বহু চেষ্টা করেও বাঁধন খুলতে পারিনি। শেষে বাথরূমে যাওয়ার জন্যে ঘ্যানঘ্যান্ শুরু করলাম। অনেকক্ষণ পর দয়া করে পায়ের বাঁধন খুলে দিল বুড়ি। তারপর...'

'ফ্লাইং কিক্,' রানা বলল।

হেসে ফেলল সোহানা। 'হ্যাঁ।'

'প্লেনে খাবার-দাবার আছে কিছু?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'গুড। খিদেয় নাড়িভুঁড়ি জ্বলছে আমার।'

ক্যাল্লে মন্টেনিগ্রোর কাছে এসে হাঁটার গতি কমাল রানা। সজাগ, সতর্ক হয়ে উঠল। 'অস্ত্র আছে তোমার সাথে?'

'না।'

ওভারকোটের পকেট থেকে একটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন বের করে ওকে দিল রানা। 'চেক করে দেখো।'

অভ্যস্ত হাতে কাজটা সারল সোহানা, মাথা ঝাঁকাল। 'ফুল লোডেড।' কোমরে গুঁজে রাখল। ওদিকে গতি কমাতে কমাতে দাঁড়িয়েই পড়ল রানা। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল ক্যাল্লে মন্টেনিগ্রোর দিকে। ফার্নান্দেজের অফিস যে বিল্ডিঙে, সেটার ওপরও ভাল করে নজর বোলাল। ব্যাপার টের পেয়ে সোহানাও চুপ হয়ে গেছে। বুঝতে পেরেছে রানার উদ্দেশ্য।

কোথাও কিছু নেই, একদম খাঁ খাঁ করছে রাস্তা, তার ওপাশের টাউন স্কয়ার। কোন নড়াচড়া নেই। সাড়াশব্দও নেই। শেষের ব্যাপারটাই সন্দিহান করে তুলেছে রানাকে। পছন্দ হচ্ছে না। মাথা কাত করে কান পাতল, এ লাইনে ওর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা বলছে কোথাও কিছু না কিছু গোলমাল আছে। কিন্তু সেটা কি, ধরতে পারছে না।

লঘু কদমে কয়েক পা এগোল ও। প্রতিটা পেশী ছিলার মত টান্‌টান্ হয়ে আছে। ফার্নান্দেজের বিল্ডিং অতিক্রম করে এল ওরা। স্টেব্‌ল্‌টার উল্টোদিকে আপন শ্যাফটের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা যেন-তেনভাবে তৈরি একটা ডাঙ্কি-কার্টের কাছে এসে দাঁড়াল, তখনই ব্যাপার টের পেয়ে আঁতকে উঠল রানা। স্টেব্‌লের শাটার তোলা, ভেতরে অন্ধকার। একটু আগের ভীত পশুগুলোর সাড়া নেই।

'ফাঁদে পড়েছি আমরা,' দ্রুত বলল ও।

কথাটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, আচমকা অন্ধকার স্টেব্‌ল্ থেকে চার-পাঁচটা রাইফেল গর্জে উঠল একযোগে। আওয়াজ শুনে মনে হলো এক হাজার রাইফেল হবে কম করেও। কিন্তু এ মুহূর্তে একদম খোলা জায়গায় দাঁড়ানো রানা-সোহানার জন্যে হাজারটায়

বা চার-পাঁচটায় কোন তফাত নেই। সবই সমান বিপজ্জনক।

'কার্টের আড়ালে যাও!' বলেই ধাক্কা মেরে সোহানাকে সেদিকে এগিয়ে দিল ও, পরমুহূর্তে বসে পড়ে দ্বিতীয় স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন থেকে এক লহমায় তিনটে গুলি করল স্টেব্‌ল্ লক্ষ্য করে। তারপর বসা অবস্থায়ই দুই লাফে সোহানার পাশে চলে এল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ব্যারিকেড দেখে। তৈরি যেভাবেই করা হয়ে থাকুক, ওদের উদ্দেশ্য পূরণে জিনিসটা এ মুহূর্তে অতুলনীয়। গুলি ওদের ধারেকাছেও আসবে না।

'বেছে বেছে গুলি করো, সোহানা!' চেঁচিয়ে বলল ও।

ওদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে বিঁধছে পুরু কার্টের গায়ে, কাঠের চল্‌টা ছিট্‌কে উঠছে শূন্যে, বৃষ্টির মত পড়তে থাকা তুষারের পর্দায় বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে প্রতিটা বিস্ফোরণ। ব্যাটাদের অ্যামিউনিশনের ভাণ্ডার যেন অফুরন্ত, অনবরত গুলি করছে। এদিকে ওদের আছে খুব সামান্যই। রানার দখল করা চারটে অস্ত্রে যে ক'টা আছে, তাই সম্বল। শত্রুর একশোটা গুলির জবাবে ওরা দুটোর বেশি ছুঁড়তে সাহস পাচ্ছে না।

তাতেও কাজ মন্দ এগোচ্ছে না, গান ফ্ল্যাশ সই করে গুলি ছোঁড়ার ফলে পাঁচ মিনিটেই দুটো রাইফেল স্তব্ধ হয়ে গেল। গান মায্‌লের ফ্ল্যাশ পুরো মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ওগুলোকে ভয়ঙ্করভাবে ঝাঁকি খেতে দেখে যা বোঝার বুঝে নিল রানা-সোহানা, মানুষ ছেড়ে ফ্ল্যাশ শিকার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

একটু পরই সোহানার গুলি খেয়ে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে উঠল তৃতীয় রাইফেলধারী। এক হাতে গাল চেপে ধরে দিশেহারার মত লাফাতে লাফাতে রাস্তায় বেরিয়ে এল। সঙ্গীদের লাইন অভ ফায়ারে দাঁড়িয়ে নাচছে আর চেঁচাচ্ছে। ওদেরকে কিছু করতে হলো না, সঙ্গীরাই তার ব্যবস্থা করল। পিঠে গুলি খেয়ে আছড়ে পড়ে একগাদা তুষার ওড়াল লোকটা, স্থির হয়ে গেল।

ও পক্ষে আর তিনজন আছে, ফ্ল্যাশ গুনে নিশ্চিত হয়ে নিল

রানা। একসাথে ঝামেলা শেষ করে ফেলার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'ওদিকে খেয়াল রাখো,' সোহানাকে বলল রানা। 'আমি এদিকে জরুরী একটা কাজ সেরে নিই।'

কার্টের হাবের সাথে ফিট্ করা ভারী চাকা আটকে রাখার হাতখানেক দীর্ঘ গোঁজ ধরে ওকে টানাহ্যাঁচড়া করতে দেখে চোখ কোঁচকাল সোহানা। 'কি করছ?'

'গ্রেনেড ক্যারিয়ার বানাচ্ছি।' ফার্নান্দেজের ভারী ম্যাকারভ পিস্তল বের করল ও, বাঁট দিয়ে চারদিক থেকে আঘাত করে গোঁজটা ঢিল করে ফেলল। হ্যাঁচকা কয়েক টানে তুলে আনল শ্যাফট থেকে। ওটা ফেলে পুরু চাকাটা নিয়ে পড়ল এবার। মাটিতে বসে দু'পা তুলে কার্টের সাথে ঠেকাল রানা, তারপর দু'হাতে দু'দিক থেকে চাকাটা ধরে নিজের দিকে টানতে শুরু করল। মিনিট খানেক টানাটানির পর একটু একটু করে এগিয়ে আসতে লাগল চাকা, এক সময় লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল হাবের গা থেকে।

ভারী কার্ট ক্যাঁচকোঁচ শব্দে তীব্র প্রতিবাদ জানাল, ওদের দিকটা ধপ্ করে আছড়ে পড়ল রাস্তায়। এক অ্যাক্সেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কার্ট। চাকাটাকে কার্টের গায়ে ঠেস্ দিয়ে রেখে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল এবার রানা, ভেতর থেকে টিপে টিপে দেখে বিশেষ একটা সিগারেট বের করল।

'কি ওটা?' প্রশ্ন করল সোহানা।

'ক্যামোফ্লেজড্ গ্রেনেড,' বলল ও।

টাইম-ফিউজ ইনসেন্ডিয়ারি ডিভাইস ওটা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশরা এই জিনিসের সাহায্যে নাজিদের বিরুদ্ধে অনেক স্যাবোটাজ করেছে। এর ফিউজ ম্যাচ হচ্ছে ফিল্টারের মত স্টেম। মূল 'সিগারেটের' যত কাছ থেকে ওটা ভাঙা হয়, তত দ্রুত ঘটে বিস্ফোরণ।

কাজ শেষ হতে আন্দাজ মত স্টেম ভেঙে গ্রেনেডটা চাকার মাঝখানের ফুটোয় খাড়া করে বসিয়ে দিল ও, একদম খাপে খাপে বসে গেল জিনিসটা—পড়ে যাওয়ার ভয় নেই।

'এবার দুই-একটা গুলি করো,' সোহানাকে বলল ও। 'কাভার দাও আমাকে।'

'এটায় আর মাত্র তিনটে গুলি আছে, রানা।'

'ঘাবড়াও মাত্। চাকাটা স্টেব্‌ল্ পর্যন্ত পৌঁছলে গুলির আর দরকার হবে না। ওকে, নাউ!'

গুলি করতে শুরু করল সোহানা, এই ফাঁকে উঠে দাঁড়িয়ে চাকাটাকে স্টেব্‌লের দিকে সজোরে গড়িয়ে দিল রানা। পুরু তুষারের ওপর দিয়ে ছোট ছোট লাফে এগিয়ে গেল ওটা, রাস্তা পার হয়ে ওপাশের ড্রেনের কিনারায় পড়ে শেষ লাফটা দিল। তারপর উড়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল স্টেবলে। টান্‌টান্ উত্তেজনার কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল, কোথায় কি! ফাটছে না গ্রেনেড। ওটার আশা ছেড়ে দিল হতাশ রানা, বুঝে ফেলেছে চাকাটা শেষ লাফ দেয়ার সময় ঝাঁকিতে পড়ে গেছে গ্রেনেড। হয়তো ড্রেনের মধ্যেই···

নীলচে তীব্র আলোর ঝলক ও ভয়াবহ বিস্ফোরণের শব্দে চমকে উঠল ওরা। তার সাথে যোগ হলো আহতদের মরণ চিৎকার। প্রচণ্ড বেগে স্টেব্‌লের আস্ত চাল উড়ে গেল, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল ভেতরে, দেখতে দেখতে ধরে গেল কাঠের ফ্রেমওয়ার্কে।

কেউ বের হলো না ভেতর থেকে। সাহায্যের আবেদনও জানাল না কেউ।

তুষারপাতের পরিমাণ আরও বেড়েছে। প্রায় স্রোতের মত ঝরছে। অসহ্য কনকনে ঠাণ্ডায় ফুসফুস সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে ওদের, চোখে হুল ফুটছে যেন। আঙুল অসাড়, শক্ত হয়ে আসছে। নিচে

ক্যারিবিয়ান পাহাড় সমান উঁচু হয়ে আছড়ে পড়ছে এ-ওর গায়ে, কালোর ওপর নীলচে ফসফরেসেন্ট ফেনার ব্যস্ত ছোটাছুটি। গর্জনে কান পাতা দায়। তবে বাতাস তীরের দিক থেকে বইছে বলে জলোচ্ছ্বাসের কোন আশঙ্কা নেই দেখে কিছুটা স্বস্তি বোধ করল রানা।

প্লেনের কাছে পৌঁছতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগল ওদের। সোহানা উঠে বসল পাইলটের বাঁ-হাতি সীটে। শীতে সশব্দে বাড়ি খাচ্ছে ওর দু'পাটি দাঁত। প্রথমেই হিটার অন করল ও, তারপর স্টার্ট দিয়ে দ্রুত সেরে নিল প্রি-ফ্লাইট চেকিং। উইন্ডশীল্ডের ওপাশের সাদা সৈকতে চোখ বুলিয়ে রানার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল। 'চললাম। শক্ত হয়ে বোসো।'

ব্রেক রিলিজ করে থ্রটল খানিকটা সামনে ঠেলে দিল, শিউরে উঠল সেসনা, তুষারের পর্দা ভেদ করে চঞ্চল প্রজাপতির মত ছুটল। জোর বাতাসের প্রতিরোধ উপেক্ষা করে কিছুদূর গিয়েই থ্রটল আরও ঠেলে দিল সোহানা, উঠে পড়ল শূন্যে। ওপরে উঠেই ছত্রিশ ফুট উইংস্প্যানের খুদে প্লেনটা ম্যাচবাক্সের মত খাবি খেতে শুরু করল।

ওটাকে সামাল দিতে হিমশিম অবস্থা সোহানার। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে তুখোড় পাইলটের মত অভ্যস্ত হাতে হুইল আর পেডালের সাথে রীতিমত যুদ্ধ করছে। মৃগী রোগীর মত ক্রমাগত ঝাঁকি খেতে খেতে দু'হাজার ফুট উচ্চতায় উঠে এল সেসনা। ট্যাকোমিটার তেইশশোতে উঠে এসেছে দেখে প্লেনের নাক সমান্তরাল করল সোহানা।

প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সত্যিই ওস্তাদ পাইলট হয়ে উঠেছ তুমি।'

'ধন্যবাদ। এবার বলো কোনদিকে যেতে হবে।'

'চিন্তায় ফেলে দিলে,' অন্যমনস্ক চেহারায় বলে সাথের হ্যান্ডব্যাগটা খুলল রানা। টেম্পল থেকে উদ্ধার করা পাসপোর্ট

ইত্যাদিতে চোখ বোলাতে লাগল। কাজের ফাঁকে ওগুলোর জোগাড় বৃত্তান্ত সংক্ষেপে জানাল সোহানাকে।

ব্যাগটার মালিকের নাম সেনিয়রা আনা মোয়য়াদা, তার আইডিতে নজর বোলাতে জানা গেল। মহিলা বিধবা। কোস্টারিকার পুন্টারেনাসের হোটেল ভ্যাকাসিওনেসের আমা ডি কাসা। অর্থাৎ সেখানকার ভ্যাকেশন হোটেলের হাউস কীপার ছিল মহিলা, যদি এই ডকুমেন্ট ভুয়া না হয়ে থাকে।

টেকোর নাম টনিচি কার্পো। পাসপোর্টের দাবি অনুযায়ী হন্ডুরাসের পোলেনসিয়া শহরের এক সেলসম্যান ছিল সে। মুরগির ডিম আকৃতির চোখওয়ালা লোকটার নাম র‍্যামন বাটুক। পানামার আইলা ডি সাংরি তার ঠিকানা। পেশা লেস ফিতে বিক্রি।

'আইলা ডি সাংরি?' সোহানা বলল। 'ব্লাড আইল্যান্ড! ওখানে লেস ফিতে বিক্রি করত?'

'হতে পারে না?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'ওই দ্বীপের মালিকও তো তাই ছিল।' কাগজপত্র ব্যাগে ভরল ও। 'হন্ডুরাস চলো। পোলেনসিয়া। চেনো তো?'

ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়ল ও। 'নামটা এই প্রথম শুনলাম।'

গম্ভীর হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'এই জন্যেই সেদিন বুড়োকে বলেছিলাম কথাটা।'

'কি কথা?'

'সুন্দরী পাইলট হলেই হয় না, তার কিছু অ্যারোনটিক্যাল জ্ঞানও থাকা চাই।'

কনুই চালাতে গিয়েও থেমে গেল সোহানা। 'মাফ করে দিলাম। আহত, অসহায়কে আঘাত করা আমার নীতিবিরুদ্ধ। তোমার সীটের সাইড পকেটে কয়েকটা চার্ট আছে, রানা। বের করো।'

করল রানা। অনেকগুলো চার্ট বের হলো পকেট থেকে।

মেক্সিকো, সেন্ট্রাল এবং সাউথ আমেরিকার প্রতিটা অংশের চার্ট আছে ওর মধ্যে। প্রয়োজনীয় চার্টে চোখ বুলিয়ে মাথা ঝাঁকাল ও। 'এই যে, স্কেলের হিসেবে মনে হচ্ছে ওটা একটা গ্রাম। জনসংখ্যা দু'হাজার। রাজধানী টেগুসিগালপা আর আট হাজার ফুট উঁচু পীক এল পিকাসোর মাঝখানে ওটা।'

চিন্তিত হয়ে উঠল রানা। একটু পর বলল, 'মনে হয় ওখানে ল্যান্ড করা যাবে না। রাজধানীতেই যেতে হবে আমাদেরকে। পোলেনসিয়া থেকে বেশি দূরে নয় জায়গাটা।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'রীডিং?'

রানা রীডিং জানাতে সেসনার কোর্স অলটার করল ও, রেডিওর সুইচ অন করে কিছু শোনা যায় কি না, তার অপেক্ষায় থাকল। অনেক কিছুই শোনা গেল, কিন্তু তার সবই দুর্বোধ্য স্ট্যাটিক খড়মড়ানি, একটা শব্দও বুঝল না ওরা। রেডিও কম্পাসের কাঁটা মন্থর গতিতে ঘুরছে।

ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হলো রানার। একটা স্টেশনও সাড়া দিচ্ছে না, তা কি করে হয়? জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল ও। ধোঁয়াটে মেঘ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না। মেঘের গতি দেখে নিচের অবস্থা অনুমান করে নিল। কবীর চৌধুরীর ভারসাম্য হারানো ফিল্ড-ফোর্সই এ জন্যে দায়ী, সমস্ত সিগন্যাল তার কারণেই জ্যাম হয়ে গেছে। শুধু খারাপ আবহাওয়ার জন্যে এরকম হতে পারে না।

এখন যদি আবহাওয়া আরও খারাপ হয়, পথ হারিয়ে ফেলে ওরা, কারও সাহায্য পাওয়া যাবে না। ওর মত সোহানাও বুঝল ব্যাপারটা, অজান্তেই শিউরে উঠল দুর্ঘটনার আশঙ্কায়। মন অন্য কাজে ব্যস্ত রাখতে রানার দিকে ফিরল।

'প্রথমে পোলেনসিয়াতেই কেন, রানা?'

'কারণ ওটা প্রিনযাপোলকা থেকে উত্তরে, এবং সবচেয়ে দূরে। বাকি দুটো দক্ষিণে। কাছে।'

'তো?'

বাইরে তাকাল ও। 'ঝড়ের তেজ বাড়ছে। আরও বাড়বে। তখন দূরের পথ পাড়ি দেয়া সম্ভব হবে না।'

মাথা দোলাল সোহানা। 'আমিও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু পোলেনসিয়ায় ট্রান্সমিটার আছে, সে ব্যাপারে তুমি শিওর হলে কি করে? কারপো, বাটুক, মায়য়াদার কাগজপত্র তো ভুয়াও হতে পারে।'

'তা পারে, মানে পারত আর কি!' রানা বলল। 'কিন্তু এদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। চারটা কারণে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'যেমন? কি কি?'

'প্রথম কারণ, শুধু ওদের পাসপোর্টই নয়, ন্যাশনাল আইডিও আছে আমার কাছে,' ইঙ্গিতে হ্যান্ডব্যাগটা দেখাল ও। 'তুমি নিশ্চয়ই জানো, ফলস্ পাসপোর্ট নিয়ে অন্য কোন দেশে ঢোকা যতটা সহজ, ফলস্ আইডি কার্ড নিয়ে নিজের দেশে ঘুরে বেড়ানো তার দ্বিগুণ কঠিন। বিশেষ করে এই অঞ্চলে। এখানকার পুলিস যখন-তখন মানুষের আইডি কার্ড চেক করে। আরেকটা কারণ হলো, আমি এই তিনজনকে তিন ট্রান্সমিটারের ইনচার্জ ধরে নিয়েছি। কবীর চৌধুরী সেরকম ইঙ্গিতই দিয়েছিল। সেদিক থেকে ভেবে দেখলে বাকি তিনটা ট্রান্সমিটারের মূল ইন্সটলেশনের কাছাকাছিই থাকার কথা। আর তৃতীয় কারণ, আমার মনে হয় না এই তিনজনের জন্যে ফল্স্ কাগজ পত্র তৈরির কথা কবীর চৌধুরী কখনও ভেবেছে। ওরকম ঝুঁকি সে নিতে পারে না।'

'চতুর্থ কারণ?' প্রশ্ন করল সোহানা।

'চতুর্থ?' হাসল রানা। 'এর চেয়ে লাগসই আর কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি।'

মাথা ঝাঁকাল অন্যমনস্ক সোহানা। একটু পর হঠাৎ কি খেয়াল হতে ঘুরে তাকাল ওর দিকে। 'আরে! ভুলেই গিয়েছিলাম কথাটা। রানা, তোমার পিছনে একটা বাস্কেট আছে। খাবার আছে ওর

মধ্যে।'

মাথা নাড়ল ও। 'রুচি নষ্ট হয়ে গেছে।'

আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে কখন যেন দু'চোখ লেগে এসেছিল, হঠাৎ চোখ মেলল রানা। নিচে তাকিয়ে দূরে তুষার ঢাকা হন্ডুরাস দেখতে পেল। 'আর পনেরো মিনিট,' ওর অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাবে বলল সোহানা।

'রেডিও?'

'স্পীকটি নট। আমার মনে হয় এ অঞ্চলের কোন স্টেশনই এয়ারে নেই, রানা।'

গম্ভীর হয়ে উঠল ও। 'তাহলে বুঝতে হবে শহর ছেড়ে পালাচ্ছে মানুষ। কোন দেশের সরকারই একদম শেষ মুহূর্ত এসে না পড়া পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করে না।'

দশ মিনিট পর নিচে ফোঁটা ফোঁটা গাঢ় রং দেখে রানা বুঝল ওটা টেগুসিগালপা। অন্ধকার। ভয় ধরে গেল রানার। এত অন্ধকার কেন? কোথাও একটা আলোরও চিহ্ন নেই কেন? মনে হচ্ছে শহরটায় কোন প্রাণের অস্তিত্বই নেই। প্রায় চার লাখ শহরবাসীর সবাই পালিয়েছে?

'এয়ার ফিল্ড শহরের দক্ষিণে,' সোহানা বলল। 'প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচুতে। ভিজিবিলিটি এরকম হলে ল্যান্ডিং রাফ হবে।'

'দ্রুত টেক অফ করতে হতে পারে,' সীট বেল্ট বাঁধার ফাঁকে বলল ও। 'তৈরি থেকো। হয়তো কোন রিসেপশন পার্টি অপেক্ষায় আছে।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা, টেগুসিগালপাকে ঘিরে কয়েকটা চক্কর দিয়ে নামতে শুরু করল।

হন্ডুরাস প্রায় নিকারাগুয়ার মতই। কিছু অপ্রশস্ত-উপকূলীয় সমতল এলাকা ছাড়া পুরোটাই পাহাড়ের ওপর গড়ে উঠেছে। অনুন্নত দেশ, মূলত কৃষি নির্ভর। প্রায় সাড়ে চার শতাব্দীর পুরানো শহর টেগুসিগালপা। জাতীয় ইউনিভার্সিটি ও আঠারো শতাব্দীর

দুই টাওয়ারের একটা ক্যাথেড্রালের জন্যে এ অঞ্চল বিখ্যাত।

কিন্তু এ-মুহূর্তে নিকারাগুয়ার মতই আর্কটিক ওয়েইস্টল্যান্ডে পরিণত হয়েছে এটাও।

টাচ্ ডাউন করল সেসনা, বাউন্স করল। আবার পড়ল। এরকম তিন-চারবার করার পর স্কিড্ করতে করতে ছুটল।

দশ

সামলে নিল সোহানা, টাওয়ারের দিকে এগোল বেশ কয়েকটা প্লেনকে পাশ কাটিয়ে। তার মধ্যে আছে কয়েকটা দাদার আমলের ওয়ার-সারপ্লাস পি-৫১ মাসটাং, একটা ডিসি ৪ ও কয়েকটা অচল এফ-৫ জেট। কোন কমার্শিয়াল এয়ারলাইনার চোখে পড়ল না ওদের। হ্যাঙ্গার, কন্ট্রোল টাওয়ার বা প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জ–একটা আলো নেই কোথাও। নেই প্রাণের চিহ্ন।

কিছুক্ষণ আগের সন্দেহটা দৃঢ় হলো রানার–শহর ছেড়ে পালিয়েছে মানুষজন, এবং খুব অল্প সময়ের নোটিসে। এমন অভাবিত বিপর্যয় এলে এ ছাড়া আর করবেই বা কি মানুষ?

ল্যান্ডিং লাইট অফ করে ডিপোর দিকে এগোল সোহানা, জায়গামত পৌঁছে দ্রুত সেসনা ঘুরিয়ে ফেলল যাতে প্রয়োজনে পালাবার মত যথেষ্ট রানওয়ে পাওয়া যায়। কোন অফিশিয়াল এগিয়ে এল না ওদের দিকে, কন্ট্রোল টাওয়ারও জানতে চাইল না কিছু। এলোমেলো বাতাসের গোঁ-গোঁ গর্জন ছাড়া কোন আওয়াজ নেই। উড়ন্ত তুষার ছাড়া নড়ছে না কিছু।

'কিছু দেখতে পাচ্ছ?' সোহানা বলল।

মাথা নাড়ল রানা। 'না। তুমি নেমো না, আমি ঘুরেফিরে দেখে আসি অবস্থা।' বাতাসের সাথে লড়াই করে দরজা খুলল, সঙ্গে সঙ্গে দমকা হিম বাতাসে চমৎকার উষ্ণ ককপিট আইসবক্সে পরিণত হলো। শিউরে উঠল সোহানা। দরজা লাগিয়ে ফার্নান্দেজের ম্যাকারভ পিএম বের করল রানা, প্যাসেঞ্জার'স লাউঞ্জের দিকে দৌড় লাগাল মাথা নিচু করে।

জনহীন লাউঞ্জে ঢোকার পরপরই ডানদিকের দেয়ালে সুইচ দেখতে পেয়ে 'অন' করল ও। লাভ হলো না, আলো জ্বলছে না। কয়েকবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল, কারেন্ট নেই। দরজা খোলা পেয়ে তীব্রবেগে ভেতরে ঢুকে পড়ল বাতাস, কাগজপত্র উড়ে বেড়াতে লাগল চারদিকে। প্রতিটা টিকেট বুদ, ওয়েটিং রুম ঘুরে দেখে নিশ্চিত হলো, কেউ নেই এখানে।

বেরিয়ে এসে কন্ট্রোল টাওয়ার চেক করল–খালি। অবশেষে কয়েকটা হ্যাঙ্গারের প্রথমটায় চলে এল। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসতে খানিকটা ভেতরের দিকে একটা গাড়ি দেখতে পেয়ে দ্রুত এগোল। একটা মিলিটারি ল্যান্ড-রোভার ওটা। হার্ডটপ। ভেতরে দড়ির একটা কয়েল আর একটা ফার্স্ট এইড কিট ছাড়া কিছু নেই।

গাড়িটা অচল মাল নয় দেখে খুশি হয়ে উঠল ও। বেরিয়ে এসে হাত নেড়ে সোহানাকে সেসনা নিয়ে ভেতরে চলে আসার সঙ্কেত দিল। পাঁচ মিনিট পর প্লেন ভেতরে পার্ক করে নেমে পড়ল সোহানা, পথ চলার একটা বাহন দেখে খুশি হয়ে উঠল। গাড়িটার ফুয়েল ট্যাঙ্ক অর্ধেক খালি দেখে খুঁজেপেতে ছয়টা জেরি-ক্যান জোগাড় করল দু'জনে মিলে। হ্যাঙ্গারের সামনের পাম্প থেকে রেগুলার ফুয়েল ভরতে এল, কিন্তু কাজ হলো না। কারেন্ট নেই বলে চলছে না পাম্প।

রেগুলার ফুয়েলের আশা বাদ দিয়ে এভিয়েশন অয়েল কোথায়

আছে খুঁজতে শুরু করল রানা। জানে, এয়ারপোর্টে ওই জিনিস থাকতে বাধ্য। বেশি খুঁজতে হলো না, খানিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা হতুরান এয়ার পুলিসের ছাপ মারা এক পুরানো, পরিত্যক্ত প্রপ-জব প্লেনের আড়ালে বড় বড় কয়েকটা ড্রাম দেখে এগোল রানা। ওর ধারণাই ঠিক, হাই-অকটেন এভিয়েশন ফুয়েল রয়েছে ওগুলোয়।

ছয় জেরি-ক্যান কানায় কানায় ভরে নিয়ে রোভারের পিছনে তুলে দিল ওরা। রওনা হওয়ার আগে রানার পুরানো ব্যান্ডেজ খুলে ফেলল সোহানা নতুন একটা বাঁধবে বলে। ক্ষতমুখের রক্ত জমাট বেঁধে আছে দেখে খুশি হলো রানা, শুকোচ্ছে। ছিদ্র বুজে গেছে অনেকখানি। কিটে স্টেরাইল গজ পাওয়া গেল, কিন্তু উপযুক্ত ওষুধ নেই। কুছ পরোয়া নেই, ব্যান্ডেজটা তো নতুন করে বাঁধা গেল!

একটু পর গাড়ি স্টার্ট দিল রানা। পরমুহূর্তে চমকে গেল হ্যাঙ্গারের ভেতর এঞ্জিনের বিকট ফট্-ফট্ আওয়াজ শুনে। একটু পর টের পেল আওয়াজটা ওদের জীপই করছে—সাইলেন্সার পাইপ ভাঙা ওটার। তারওপর হিটার নামের যে জিনিসটা রয়েছে, তাতে মানুষ তো দূরের কথা, ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় একটা বান-রুটিও কুসুম-গরম হবে কি না সন্দেহ।

সবচেয়ে বড় যে সমস্যা দেখা দিল, তা হলো ধোঁয়া। কামান দাগার মত ক্রমাগত ফট্-ফট্ শব্দের সাথে পাল্লা দিয়ে ধোঁয়াও খালাস করছে এঞ্জিন, দেখতে দেখতে আঁধার করে তুলল ক্যাব। শেষ পর্যন্ত কার্বন মনোক্সাইডে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরতে হয় কি না ভেবে শঙ্কিত না হয়ে পারল না রানা। কিন্তু উপায় নেই।

গড়াতে শুরু করল রোভার, হাঁটুর ওপর স্থানীয় অ্যারোনটিক্যাল ম্যাপ বিছিয়ে রানাকে পথ নির্দেশ দিয়ে চলল সোহানা। জটিল, বিপজ্জনক রুট। সরু। অসংখ্য পাহাড়ের ওপর দিয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে গেছে। তুষার জমে পিচ্ছিল

হয়ে আছে, একটু এদিক-ওদিক হলেই সর্বনাশ। তারওপর তুষারের পর্দা আগের তুলনায় এ মুহূর্তে অনেক ঘন হয়ে উঠেছে বলে বেশিদূর দেখাও যায় না। মাথার ওপর ঘন, গাঢ় মেঘের পাহাড় ঝুলে আছে, তার সাথে কুয়াশার ধোঁয়া ধোঁয়া স্তর, সব মিলিয়ে মহাবিপজ্জনক হয়ে উঠল ওদের যাত্রা।

বেশ কয়েক মাইল পুবে এসে প্রথমবার প্রাণের স্পন্দন চোখে পড়ল। পিঁপড়ের মত দল বেঁধে টেগুসিগালপার উদ্দেশে হেঁটে চলেছে হাজার হাজার মানুষ। বাড়িঘর ছেড়ে পালাচ্ছে। বেশি বয়স্ক, অক্ষমদের কেউ কেউ ঘোড়া বা গাধার পিঠে চড়ে চলেছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই অল্প। কোলের শিশু থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ, সবাই আছে তার মধ্যে। সবার চেহারায় মৃত্যুভয়। নিজেকে নিয়ে আছে প্রত্যেকে, আর কারও দিকে তাকাবার সময় নেই। ভিড়ের মধ্যে সন্তান হারিয়ে মা কাঁদছে, পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে তার খোঁজে, কেউ একবার জিজ্ঞেসও করছে না কি হয়েছে। পা পিছলে গভীর খাদে পড়ে গেছে কিশোরী মেয়ে, বাপ সেদিকে এক পলক তাকিয়ে আবার পা বাড়িয়েছে নিজের পথে। কারণ মেয়েকে তোলা সম্ভব নয়, যদি সম্ভব হয়ও, দেরি হলে বরফ হয়ে যাওয়ার ভয় আছে।

কিন্তু মা নড়ছে না জায়গা ছেড়ে। নিচ থেকে নাড়ি ছেঁড়া ধনের অসহায় আর্তচিৎকার শুনে কাঁদছে বুক চাপড়ে। তাই দেখে কেঁদে ফেলল সোহানা। পানি জমল রানার চোখেও। কিন্তু করার কিছু নেই দেখে জোর করে মন অন্যদিকে ব্যস্ত রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল।

উল্টো স্রোত ঠেলে কিছুদূর এগিয়ে রোভার দাঁড় করাল ও। জানালার প্লেক্সিগ্লাস নামিয়ে ভাঙা ভাঙা মেসতিজোতে এক যুবককে জিজ্ঞেস করল, 'পোলেনসিয়া এখান থেকে কত দূর?'

দাঁড়িয়ে পড়ল সে। গায়ের শতছিন্ন পঞ্চো দিয়ে শীতার্ত দেহ ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। 'এক ঘণ্টার পথ, সেনিয়র। কিন্তু

পথ খুব খারাপ। ফিরে যান।'

'না, আমাদের যেতেই হবে,' ও বলল। 'গ্রাসিয়াস।'

কাছে এসে দাঁড়াল যুবক। 'আমি পোলেনসিয়া থেকে আসছি, সেনিয়র। ওদিকে সেনিয়রিটাকে নিয়ে না যাওয়াই ভাল।'

'কেন?'

'গ্রামটা কিছু অস্ত্রধারী দখল করে নিয়েছে। আমাদেরকে বের করে দিয়েছে ওরা গ্রাম থেকে।'

বুকটা আনন্দে নেচে উঠল ওর। 'তাই নাকি? ভাববেন না, আমরা সতর্ক থাকব। মাচাস গ্রাসিয়াস, সেনিয়র।' কাঁচ তুলে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা।

'যাক,' সোহানা বলল। 'সঠিক জায়গাতেই যাচ্ছি আমরা।'

জবাবে কিছু বলল না ও। দু'হাতের শক্ত মুঠোয় স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরল। বিপজ্জনক গতিতে ছোটাল ল্যান্ড-রোভার। এক ঘণ্টা নয়, চল্লিশ মিনিটের মাথায় তেকোনা এক উপত্যকার মালভূমিতে পৌঁছল ওরা। উপত্যকার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে খুদে, হতশ্রী গ্রাম পোলেনসিয়া। চারদিকে এত ঘন হয়ে তুষার জমে আছে যে তার আভায় ধাঁধা লেগে গেল ওদের চোখে।

সবুজের চিহ্নও নেই মাটিতে, সব ঢেকে ফেলেছে তুষার। কোথাও সমান, কোথাও ঢিপির মত জমে আছে। নিরেট বরফ হয়ে গেছে। উপত্যকার মাঝখান দিয়ে উচ্ছল গতিতে খল্ খল্ করে বয়ে চলেছে একটা নদী। ওটা কোন জায়গায় উপত্যকায় এসে পড়েছে, গাড়িতে বসেই দেখতে পাচ্ছে রানা। অনেক ওপর থেকে নেমে এসেছে। দুই তীরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ছোটখাট পাহাড়সমান অনেকগুলো বরফের টিলা। আর আছে বড় একটা ঝরনা। বরফ গলা পানি ঝরঝর করে পড়ছে নদীতে, ফলে দু'কূল ছাপিয়ে অসম্ভব গতিতে ছুটছে নদী।

গ্রামটার ওপর নজর বোলাল রানা। প্রায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অল্প কিছু ঘরবাড়ি, সবগুলোর ছাদে পুরু হয়ে তুষার জমে

আছে। ওগুলোর মাঝখানে একটা চার্চ। নিশ্চয়ই ওটার বেল টাওয়ারে দাঁড়িয়ে কেউ নজর রাখছে চারদিকে। অন্য যারা আছে, তাদের কেউ কেউ রাস্তায় টহল দিচ্ছে হয়তো। চোখের আড়ালে আছে বলে দেখা যাচ্ছে না। উপত্যকার ব্লাফে ছয়জনকে দেখতে পেল ও। সাদার ওপর ছয়টা গাঢ় দাগ।

গ্রামে ঢোকার পথের ওপর আছে আরও দু'জন। একটা কাঠের ব্যারিকেডের কাছে দাঁড়িয়ে লেফট-রাইট করছে।

'ওরা এখনও দেখতে পায়নি আমাদের,' সোহানা বলল। 'তাহলে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত না।'

চারদিকে ঘন ঘন নজর ঘোরাতে লাগল রানা, কিছু ভাবছে। কপাল কুঁচকে আছে। 'এখানে বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল ও। 'তাড়াতাড়ি ওদের একটা ব্যবস্থা করতে হয়।'

'কি ব্যবস্থা?'

'দাঁড়াও,' ফার্নান্দেজের ম্যাকারভ পিএম বের করল ও। চেক্ করে দেখল চেম্বারে চারটে গুলি আছে। 'তোমারটায় কয়টা আছে?'

'একটা,' সোহানা বলল। 'কেন?'

'ওটা দাও আমাকে।'

'কি করবে?'

ভুরু কুঁচকে ভাবছে রানা, জবাব দিল না। সিগারেটের প্যাকেট থেকে শেষ টাইম-ফিউজ গ্রেনেডটা বের করল।

'কি করতে চাইছ, রানা?' উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে সোহানাকে।

ওর কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। 'শোনো, সোহানা। আমি যদি এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে না আসি, তুমি...'

'কি করতে যাচ্ছ বলছ না কেন?' এবার রেগেই উঠল ও। ফরসা মুখটা লাল রং ধারণ করেছে।

'অত কথার সময় নেই,' দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা।

ওভারকোট খুলে ছুঁড়ে দিল গাড়িতে। 'যা বলি মন দিয়ে শোনো। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে না ফিরলে টেগুসিগালপা চলে যাবে তুমি।'

কথা শেষ করে আর দাঁড়াল না, দড়ির কয়েলটা কাঁধে তুলে নিয়ে ঘুরে হন্-হন্ করে হেঁটে দূরে সরে যেতে লাগল। যদিও ওকে সঙ্গে আনলে সুবিধেই হত, কিন্তু সোহানার ব্যাপারে কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয় রানা। ওদিকে সোহানা কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেখাবার সময়ই পেল না। বোকার মত রানার অপসৃয়মান পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকল। কিছুদূর এসে একবার ঘুরে তাকাল রানা, সোহানার চাউনি দেখে খারাপ লাগল। ইচ্ছে হলো ফিরে গিয়ে ওকে একটু আদর করতে, কিন্তু এখন সময় নেই। দ্রুত পায়ে মালভূমিতে পৌছল ও, উপত্যকার ব্লাফে পৌছার জন্যে পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল। অসহ্য শীতে কাঁপছে ঠক্-ঠক্ করে, দু'পাটি দাঁত খটাখট্ বাড়ি খাচ্ছে।

থেমে থেমে এগোচ্ছে ও। এক পা এগোবার আগে পা দিয়ে তুষার ঠুকে ঠুকে ভাল করে বসিয়ে নিচ্ছে, যাতে ওর ভারে দেবে না যায় সারফেস, কোথাও অদৃশ্য গর্ত থাকলে আছাড় খেয়ে পা ভাঙতে না হয়। এর ফলে খুব ধীর হয়ে উঠেছে ওর গতি। অল্পক্ষণের মধ্যে পা দুটোর অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল। ব্যথায় টনটন্ করতে লাগল পায়ের পেশী, উরু, সব।

এক সময় দুঃস্বপ্ন শেষ হলো, ক্লিফের কিনারায় এসে পৌছল রানা। চুড়োর দিকে উঠে যেতে লাগল। পাহাড়ী ঝোপ, পরগাছার জঙ্গল ইত্যাদি পেরিয়ে বেশ গভীর এক ফার ও পাইন বনে ঢুকল হি-হি করতে করতে। বাতাসের তাড়নায় দীর্ঘ কনিফার, ওক ও দেবদারু তাণ্ডব নৃত্য করছে মাথার ওপর। ডালপালা চাবুকের মত সাঁই সাঁই আওয়াজ তুলে তেড়ে মারতে আসছে। ওগুলোর হাত থেকে বাঁচতে দু'হাত সামনে বাড়িয়ে রাখতে হচ্ছে রানাকে। একটু অসতর্ক হলেই নাকে-মুখে, বুকে এসে পড়ছে চাবুক।

ওপরে তুষারের পুরু আবরণ থাকা সত্ত্বেও রানার বুঝতে

অসুবিধে হলো না যে নদীটা যেখান থেকে ঢালু হয়ে উপত্যকায় নেমে গেছে, তার সামান্য আগের এক টিলার ওপরে জন্মেছে এই গাছগুলো। ওর মধ্যে স্প্রুস (Spruce) নামে দেবদারু প্রজাতির গায়ে গায়ে লেগে বেড়ে ওঠা প্রকাণ্ড কিছু গাছ আছে–কাদায় জন্ম হয় ওগুলোর। ওর মধ্যে ঢুকতে বাতাসের তাড়না খানিকটা কমল।

ওর মধ্যে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে নদীর তীরে পৌছল রানা। থেমে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। কয়েলের ভারে আহত কাঁধ ব্যথা করছে খুব, ক্ষতটা দপ্-দপ্ করছে, কিন্তু তবু ওটাকে অন্য কাঁধে স্থানান্তর করার উপায় নেই। কারণ ডান হাত মুক্ত রাখতে হবে ওর।

ওখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। অপেক্ষা করছে। মানুষের পায়ের ছাপ খুঁজছে চোখ, কান খাড়া। কোনটাই নেই। না ছাপ না কিছু। নাম না জানা নদীটা সরু ড্রেনের মধ্যে দিয়ে পানি গড়ানোর মত ধীরে বইছে। ঝড়ে গাছ, বড় বড় ঝোপ, জঞ্জাল ইত্যাদি উপড়ে পড়ে নদীগর্ভের বড় বড় বোল্ডারে আটকে গেছে। রীতিমত একটা বাঁধের সৃষ্টি করেছে এখানটায়। পানির স্রোত অনেকটাই কমে গেছে তার ফলে। বরফের বড় বড় চাঙ ঠেকে আছে সেসবের সাথে, তার ওপর নতুন করে তুষার জমছে।

নিজের ডানদিকে খানিকটা এগোল ও, ক্লিফের কিনারার দিকে। নদী যেখান থেকে ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে, সেখানটা উপড়ে পড়ে আছে একটা বিরাট স্প্রুস গাছ–ওটার অর্ধেক তীরে, অর্ধেক নদীতে। শেকড় দেখে রানা বুঝল, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পড়েছে গাছটা। করণীয় ঠিক করে কাঁধ থেকে দড়ির কয়েলটা নামাল ও।

ওটার এক প্রান্ত কষে বাঁধল গাছটার সাথে, অন্য প্রান্ত নিজের কোমরে। তারপর গুলি বের করে নিয়ে একে একে অটোম্যাটিক দুটোর স্লাইড কয়েকবার সামনে পিছনে করে পরীক্ষা করে নিল।

ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে থাকতে পারে তেল, তাহলে সময়মত কাজ করবে না অস্ত্রগুলো। এবার কনকনে ঠাণ্ডা নদীতে নেমে পড়ল রানা, যথাসম্ভব নিঃশব্দে এগোল ঝরনার দিকে। বিশেষ এক প্ল্যান আছে ওর।

ক্লিফের কিনারার পনেরো গজের মধ্যে পৌঁছল ও, তারপর দশ গজের মধ্যে। নদীতে জট পাকিয়ে থাকা ডাল পাতা, ঝোপ ও বোল্ডার ইত্যাদির আড়ালে এসে দাঁড়াল। ঠিক তখনই গলাটা কানে এল।

'...এখানে পায়ের ছাপ!, আচমকা মোটা একটা কণ্ঠ বলে উঠল। 'আমি তখনই বলেছি এদিকে কিছু একটা চোখে পড়েছে আমার। ছড়িয়ে পড়ো সবাই। খুঁজে বের করো হারামজাদাকে।'

জমে গেল রানা। নিচু হয়ে খুব সাবধানে চোখ বুলাল চারদিকে–কেউ নেই। ম্যাকারভ বাগিয়ে প্রস্তুত ও।

একটু পর আরেকটা গলা উত্তেজনায়, বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল, 'আরে! এখানে দেখছি একটা দড়ি! ওপারের দিকে গেছে!'

কিছু মরা ডালের ফাঁক দিয়ে লোকগুলোকে দেখতে পেল এবার রানা। স্প্রুস গাছটার গোড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে–চারজন। মায়ান টেম্পলের গার্ডদের মত একই ইউনিফর্ম পরে আছে, তারওপর কোট, ওভারকোট, মাফলার। হাতে চামড়ার গ্লাভস। কাঁধে এফএএল রাইফেল। মুহূর্তের জন্যে হিম ঠাণ্ডা বাতাসের একটা ঝাপ্টা বয়ে গেল লোকগুলোর ওপর দিয়ে, শিউরে উঠল তারা।

'ইস্!' তৃতীয় কণ্ঠ বলল হাসতে হাসতে। 'ঠিক তোমার বোনের মত ঠাণ্ডা।'

'যা ব্যাটা!' খেঁকিয়ে উঠল দ্বিতীয় কণ্ঠধারী। 'হোসে, দড়ি ধরে টানতে থাকো। দেখি, কেমন মাছ ধরতে পারো তুমি।'

দ্রুত হাতে, নিঃশব্দে কোমর থেকে দড়ি খুলে ফেলল রানা, ছেড়ে দিল। ওপার থেকে টান খেয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে

গেল ওটা। প্রায় তখনই প্রথম কণ্ঠধারী ঘেউ ঘেউ করে উঠল, 'পায়ের ছাপ! এই তো পায়ের ছাপ!'

একযোগে চারজনই প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল তীরের নরম তুষারে পড়া রানার পায়ের ছাপের ওপর। উত্তেজিত বাক্য বিনিময় চলল কিছুক্ষণ, তারপর মুখ তুলল লোকগুলো। অস্ত্র তুলে ঢাল বেয়ে উঠে আসতে শুরু করল রানার অবস্থান লক্ষ্য করে। একজন রয়েছে আগে, ছাপ বের করছে খুঁজে খুঁজে। গ্রেনেডটা বাঁ হাতে নিল রানা, ডান হাতে ম্যাকারভ তুলল সামনের লোকটাকে সই করে।

এক সেকেন্ড পর গুলি করল। বুলেট ফোটার শব্দে কেঁপে উঠল চারদিক। দু'হাতে পেট চেপে ধরে পড়ে গেল রানার শিকার, আঁতকে উঠে মুখ তুলল বাকি তিনজন, পরক্ষণে একযোগে ডাইভ দিয়ে তুষারের ওপর পড়ল। এত কিছু এক লহমায় ঘটে গেল। এদিকে রানা গুলিটা ছুঁড়েই গ্রেনেডের স্টেম প্রায় গোড়া থেকে ভেঙে ফেলল, তারপর পানির ইঞ্চি তিনেক ওপরে জেগে থাকা প্রকাণ্ড এক গুঁড়ির মুঠো সমান চওড়া মুখওয়ালা ফোকরের মধ্যে ছেড়ে দিল ওটা। পরক্ষণে ঘুরেই নদীর অন্য তীর লক্ষ্য করে দ্রুত এগোতে চেষ্টা করল।

দশ পা-ও যেতে পেরেছে কিনা সন্দেহ, পিছনে ভয়াবহ শব্দে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। শক্ ওয়েভের ধাক্কায় পিঠ বেঁকে গেল রানার, দেহটা পানি ছেড়ে প্রায় উঠেই পড়ল। ওর মধ্যেও ডালপালা ভাঙার পট্ পট্ শব্দ শুনতে পেল রানা, একইমুহূর্তে জমাট বরফে ফাটল ধরার পিলে চমকানো চড়চড় কড়কড় আওয়াজ।

অনেক খানি উড়ে গিয়ে চার হাত-পায়ে পানিতে আছড়ে পড়ল রানা। একই মুহূর্তে আবার উঠল চড়চড় শব্দ, এবার আগেরবারের চেয়ে হাজার গুণ্ জোরাল হয়ে। পানিতে টান অনুভব করল ও, ছুটে গেছে জ্যাম। বাধা পেয়ে নদীর তলার

দিকে যে পানি জমা হচ্ছিল, অচল থাকার ফলে জমাট বেঁধে প্রায় বরফে পরিণত হয়ে এসেছিল, হঠাৎ ছাড়া পেয়ে তা আড়মোড়া ভাঙতে শুরু করল। ভিত্ নড়ে উঠতে ওপরের শক্ত বরফের স্তরেও প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হলো। মহা তোলপাড় শুরু হয়ে গেল নদীর বুকে। যা কিছু জমে ছিল, সব একযোগে নিচের দিকে যাত্রা করল।

উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল রানা, সফলও হয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে হাঁটুর পিছনে বড় এক টুকরো বরফের আঘাতে ফের পড়ে গেল। পানির টান সেকেন্ডে সেকেন্ডে বাড়ছে বুঝতে পেরে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। মাত্র কয়েক গজ যেতে পারলেই তীরে পৌঁছে যেতে পারে ও, কিন্তু পারছে না। এক সময় হাল ছেড়ে দিল রানা। মনে হলো কাজটা এ জীবনে আর হবে না ওকে দিয়ে। জলোচ্ছ্বাসের অকল্পনীয় শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখল না ও। বাঁ হাতটা সুস্থ থাকলে একটা শেষ চেষ্টা করে দেখা যেত, কিন্তু সে পথও বন্ধ। কোন কাজেই আসছে না ওটা। ভেসে যাচ্ছে মাসুদ রানা।

ওদিকে যে লোকটা ওর গুলি খেয়েছে; গ্রেনেড বিস্ফোরণের পরমুহূর্তের দৃশ্য দেখে পেটের কথা ভুলে তড়াক করে উঠে পড়ল সে। পড়িমরি করে দৌড়ে ওপর থেকে ধেয়ে আসতে থাকা স্রোতের সামনে থেকে সরে যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই তার পায়ের নিচে বড় এক ফাটল ধরতে ঝপাৎ করে পানিতে পড়েই তলিয়ে গেল সে। টান খেয়ে কোনদিক থেকে কোনদিকে গেল, আভাসও পাওয়া গেল না।

বাকি তিনজনেরও একই অবস্থা হলো। ব্যাপার বুঝে উঠতে যে কয়েকটা অমূল্য মুহূর্ত ব্যয় হলো, তাতেই লোকগুলোর জীবন-মরণ নির্ধারিত হয়ে গেল। ছুটন্ত অবস্থায় পিঠের ওপর হাজার হাজার টন পানি আর বরফের আঘাত খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল তারা। গলা ফাটানো চিৎকার করতে করতে ভেসে যেতে

লাগল।

রানা রয়েছে ওদের গজ দশেক পিছনে। নানা ধরনের জঞ্জাল আর ছোটবড় বরফের টুকরো, বোল্ডার ইত্যাদির সাথে ভেসে চলেছে অসহায়ের মত। স্রোতের গতি বাড়ছে সেকেন্ডে সেকেন্ডে। নদীর ঢালের মুখে পৌঁছেই এক লাফে দ্বিগুণ হয়ে গেল গতি, কম করেও ত্রিশ মাইল বেগে হাঁ-হাঁ করে ছুটল ও নিচের উপত্যকার দিকে। এটা-সেটার সাথে বাড়ি খেয়ে নাকমুখের অবস্থা ততক্ষণে শোচনীয়। তবে এতবড় বিপদেও সাহস হারায়নি ও, এই প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে গেলে ফল কি হবে, সে বোধ মুহূর্তের জন্যেও ছেড়ে যায়নি ওকে। লাফঝাঁপ করলে ফল যে হবে উল্টো, তা ভালই জানা আছে রানার।

তাই নিজেকে কেবল ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। মাথা পানির ওপরে তুলে রেখে স্রোতের অনুকূলেই হাত-পা ছুঁড়ছে যাতে ঠাণ্ডায় রক্ত চলাচলে সমস্যার সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এভাবেই বা কতক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব? খানিক পরপর টেনে নিচে নিয়ে যাচ্ছে ওকে স্রোত আর ঘূর্ণি, পানি খেতে খেতে ঢোল হয়ে উঠেছে পেট। ঠিকমত দম নিতে পারছে না। ঝড়ের গতিতে উপত্যকা অতিক্রম করে পোলেনসিয়া গ্রামের দিকে চলেছে ও। হাত-পা, সারা শরীর অবসন্ন। আর ভেসে থাকতে পারছে না। ইচ্ছেও করছে না।

রক্ত জমে যেতে শুরু করেছে, ভোঁতা হয়ে আসছে বোধশক্তি। সীসার মত ভারী হাত-পা নাড়তে পারছে না রানা। তলিয়ে যাচ্ছে...তলিয়ে যাচ্ছে...হাঁসফাঁস করছে দম নেয়ার জন্যে। অবশিষ্ট শক্তি এক করে শেষবারের মত মাথা জাগাল ও, ফুঁপিয়ে উঠে সশব্দে দম নিল। পরক্ষণে আবার তলিয়ে যেতে শুরু করল।

ঠিক তখনই হ্যাঁচকা টান পড়ল ওর শার্টের কলারে।

এগারো

ওরা যখন প্লেনের কাছে ফিরল, রাত হয়ে গেছে তখন। আবহাওয়া কিছুটা বদলেছে এরমধ্যে, তুষারপাতের পরিমাণ কমে এসেছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মত পড়ছে। সাদা পাউডারের মত তুষারের চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছপালা। বাতাসের কামড়ের শক্তি আগের মতই আছে অবশ্য। প্লেনের ভেতরে বসে যদিও তা টের পাওয়া যাচ্ছে না। তারওপর হ্যাঙ্গারের ভেতরে রয়েছে ওটা এ মুহূর্তে।

দূরে, টেগুসিগালপার আকাশে হলদেটে আলোর আভাস দেখে স্বস্তি বোধ করল রানা। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু হয়েছে আবার, অর্থাৎ ওর অনুমানই ঠিক। পোলেনসিয়াতেই ছিল কবীর চৌধুরীর দ্বিতীয় ট্রান্সমিটার। এখন নেই। এদিকে রাস্তাঘাট, এয়ারপোর্ট অবশ্য এখনও ফাঁকা।

ভীষণ দুর্বল বোধ করছে ও। অবসন্ন দেহ সীটে এলিয়ে দিয়ে কয়েক ঘণ্টা আগের দুঃস্বপ্নের কথা ভাবছে। অতীতের অসংখ্যবারের মত আজও খুব অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে ও। শেষবার ডুবে যাওয়ার আগমুহূর্তে নদীর কিনারার খুব কাছে ছিল। ওদিকে ওপরের বিস্ফোরণের পরপরই জলোচ্ছ্বাসের মত পানির ছুটে আসা দেখে সতর্ক হয়ে গিয়েছিল সোহানা। গাড়ি থেকে নেমে নদীর তীরে দাঁড়িয়েছিল অবস্থা বোঝার জন্যে।

ভাগ্যিস দাঁড়িয়েছিল, নইলে অজ্ঞাত নদীতে অজ্ঞাত লাশ হয়ে

ভাসতে হত এখন ওকে।

পাশে বসা সোহানাকে দেখল রানা। ড্যাশবোর্ডের সবুজাভ আলোয় অদ্ভুত সুন্দর লাগছে ওকে। চোখাচোখি হতে রানার মনের ভাবনা পড়ে ফেলল সোহানা। মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে। 'এতবড় ঝুঁকি নেয়া উচিত হয়নি তোমার, রানা,' মৃদু গলায় বলল। 'ওফ্! ভাবলে এখনও বুক কাঁপে।'

'জানি। কিন্তু উপায় ছিল না।'

'মনে হচ্ছিল তুমি বুঝি আত্মহত্যা করার পণ করেছ।'

ওর বাহুতে হাত বোলাল রানা। 'ভুলে যাও। দুটো ইন্সটলেশন গেছে, আরও দুটো খতম করতে হবে। তারপর তুমি আর আমি! এই কথাটা মাথায় রাখো কেবল। ওগুলোর বেলায় আরও মারাত্মক ঝুঁকি নিতে হতে পারে।'

নীরবে বসে থাকল ওরা। মনে মনে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করছে রানা। চাপা গুঞ্জন করছে সেসনার এঞ্জিন। হিটার চালু রাখার জন্যে স্টার্ট দিয়ে রাখতে হয়েছে। পূর্ণ শক্তিতে চলছে হিটার। তবু ভেজা কাপড় শুকোতে চাইছে না।

সোহানার চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ দেখতে পেল রানা। পুরো দু'দিন ও এক রাত না ঘুমিয়ে কাটাতে হয়েছে ওকে, ফলে মুখের সমস্ত পেশী ঢিলেঢালা হয়ে পড়েছে। চোখের সাদা অংশ লাল হয়ে উঠেছে। রানার নিজের কি অবস্থা, তা ও-ই জানে। খিদেয় পেট মুচড়ে উঠতে সীটের পিছন থেকে ঝুড়িটা টেনে আনল ও।

কিছু চকলেট ক্যান্ডিবার, কয়েকটা আপেল এবং তিনটে চিকেন স্যান্ডউইচ পাওয়া গেল ওটায়। দুজনের জন্যে একটা করে স্যান্ডউইচ ও ক্যান্ডিবার তুলে নিয়ে ঝুড়ি জায়গায় রাখল রানা। 'খেয়ে নাও,' একটা করে সোহানার হাতে তুলে দিয়ে বলল।

মাথা নাড়ল ও। 'আমার ইচ্ছে করছে না। তুমি খাও।'

'না করলেও খেতে হবে,' রানা বলল। 'এনার্জি রিজার্ভ রাখতে হবে। খাও।'

চেহারা বিকৃত করে ওগুলো নিল সোহানা, ধীরেসুস্থে খেতে শুরু করল। দেখেই বোঝা যায় গলা দিয়ে নামতে চাইছে না, তবু চালিয়ে যাচ্ছে।

'এবার কোনদিকে?' স্যান্ডউইচ শেষ করে জানতে চাইল ও।

'পুন্টারেনাস?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তবে এখনই নয়। ঘণ্টা তিনেক পরে যাত্রা করব আমরা।'

'কেন?'

'কারণ এই মুহূর্তে প্লেন চালাবার মত অবস্থায় নেই তুমি। আমিও না,' কাঁধের ক্ষতটা দেখাল ইঙ্গিতে। 'এই ঝড়ের মধ্যে প্লেন সোজা রাখা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। তাছাড়া শরীরেও আর কুলোচ্ছে না। একটু ঘুমিয়ে না নিলে জায়গামত পৌঁছতে হয়তো পারব, কিন্তু তারপর আর কিছু করার শক্তি থাকবে না।'

'কিন্তু সময় কোথায়?' সোহানা বলল।

'এরমধ্যে থেকেই বের করে নিতে হবে,' দৃঢ় গলায় বলল রানা।

কয়েক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সোহানা, তারপর মাথা দোলাল। 'ঠিকই বলেছ। একটু ঘুমিয়ে না নিলে আর চলছে না।'

সেসনা খুবই ছোট, ভেতরে ঘুমানোর মত ব্যবস্থা নেই। তাই অ্যাডজাস্টেবল সীট দুটোকেই এদিক-ওদিক করে শোয়ার ব্যবস্থা করে নিল ওরা। কোনমতে শোয়া যাবে। মাঝখানে ফুট খানেক ব্যবধান দুই সীটের।

প্রস্তুতি শেষ হতে শুয়ে পড়ল ওরা। কিন্তু ঘুম আসছে না কারও। ঘনঘন উসখুস করছে। কাত হয়ে পরস্পরের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুলো, তাকিয়ে থাকল। অনেকক্ষণ পর মৃদু হাসি ফুটল সোহানার লোভনীয় ঠোঁটে। ওর মুখের কাছে মুখ এগিয়ে নিল রানা, মৃদু গলায় বলল, 'গেছে।'

ভুরু কোঁচকাল সোহানা। 'কি?'

'ঘুম। এমন এক হাসি দিয়েছ, ঘুম-টুম পাঠিয়ে গেছে আমার।'

হাসিটা আরও প্রশস্ত হলো সোহানার। রানার দিকে একটু সরে এল ও। এক হয়ে গেল দু'জোড়া ঠোঁট।

ভোরের দিকে কোস্টারিকার উদ্দেশে হন্ডুরাস ত্যাগ করল ওরা। কবীর চৌধুরীর ফোর্স ফিল্ডে দ্বিতীয় দফা চাপ পড়ায় এদিকে ততক্ষণে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে সাগর। ক্রুদ্ধ বাতাস তাণ্ডবনৃত্য করছে, থেকে থেকে অদৃশ্য, দানবীয় হাতের প্রচণ্ড থাবড়া খেয়ে ককাচ্ছে খুদে সেসনা। কড়কড়, মড়মড় করছে। উথাল-পাতাল করছে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে।

তাণ্ডব এড়াতে বিরাট এক বৃত্ত রচনা করে এগোল সোহানা। কিছুটা কাজ হলো তাতে। কিন্তু বৃত্তের প্রান্তে পৌঁছে পুন্টারেনাসের দিকে ঘুরতেই প্রবল ঝড় ও শিলাপাতের মুখে পড়ল। ওরই মধ্যে এক ডেইরি ফার্মের মধ্যে ল্যান্ড করল সোহানা। জায়গাটা ওদের গন্তব্যের কয়েক মাইল দূরে। ততক্ষণে সেসনার উইঙ পুরু, শক্ত বরফের তলায় চাপা পড়ে গেছে।

খামারটা দেখে বোঝা গেল যথেষ্ট গরু ছিল এখানে, কিন্তু এ মুহূর্তে ফাঁকা। একটাও নেই। মানুষজনও নেই, ভয়ে পালিয়ে গেছে সব ফেলে। বিশাল ফার্ম হাউসের পিছনদিকে একটা গ্যারেজ, ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে একটা ১৯৪০ মডেলের বুইক সেডান। ওটার এঞ্জিন, ফুয়েল ট্যাঙ্ক পরীক্ষা করে খুশি হয়ে উঠল রানা—চলবে। প্লেনটাকে ভাল করে বেঁধেছেঁদে রেখে বুইক নিয়ে ছুটল ওরা। গন্তব্য হোটেল ভ্যাকাসিওনেস।

হন্ডুরান হাইল্যান্ড ও কোস্টারিকান উপকূলীয় এলাকার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখতে পেল ওরা। হন্ডুরাসের সর্বত্র তুষার জমে শক্ত বরফ হয়ে আছে, কিন্তু এখানে পরিস্থিতি

সেরকম নয়। প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছে, কিন্তু উন্মুক্ত গলফো ডি নিকোয়া দিয়ে ধেয়ে আসা প্রচণ্ড বাতাস খোলা জায়গায় জমতে দিচ্ছে না, সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে জড়ো করছে উপত্যকার রিমের কাছে, অথবা ঘরবাড়ি বা গাছপালার সাথে। ওসব জায়গায় বাধা পেয়ে বড় বড় ঢিপির মত হয়ে জমে আছে বরফ।

বাতাস হামলা করছে চারদিক থেকে। বারেবারে পথের পাশের ইরিগেশন ডিচের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বুইকটাকে, অল্পের জন্যে বেঁচে যাচ্ছে ওরা, হুইলের সাথে প্রাণপণ সংগ্রাম করে গাড়িটাকে রাস্তার মাঝখানে ফিরিয়ে আনছে রানা প্রতিবার। কাহিল অবস্থা ওর, টান পড়ায় কাঁধের ক্ষতস্থান নতুন করে দপ্-দপ্- করতে শুরু করেছে। দাঁতে দাঁত চেপে অনেক কষ্টে ড্রাইভ করছে ও।

আকাশ সাদা, চকচক করছে। নিচের বরফের প্রতিফলন ঘটছে ওখানে। প্রচণ্ড তুষারপাতের কারণে সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না রানা, দু'পাশের গাছপালা কোনমতে দেখতে পাচ্ছে কেবল। ভীষণ আক্ষেপে ডালপালা দুলছে, চাবুকের মত আছড়ে পড়ছে বুইকের ওপর। বিকট ফাঁপা আওয়াজ উঠছে আঘাতের ফলে।

অবশেষে গন্তব্যের কাছে এসে পৌঁছল ওরা। রাজধানী সান হোসের নব্বই কিলোমিটার পশ্চিমে শহরটা, দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর। রানার জানামতে এখানকার জনসংখ্যা এক লাখের ওপরে, অথচ এ মুহূর্তে শহরটাকে বিশাল এক মৃত্যুপুরীর মত লাগছে। সাদা চাদরে ঢাকা বিরান এক প্রান্তর। মানুষ, গবাদিপশু, কিচ্ছু নেই। কোথাও প্রাণের সাড়া নেই। বিদ্যুৎ নেই, অন্ধকার।

হারবারে দুটো ক্রুজ শিপ ও গোটা ছয়েক মাছ ধরার ট্রলার দেখতে পেল ওরা। কম করেও পাঁচ ইঞ্চি পুরু, কঠিন বরফের তলায় ঢাকা পড়ে আছে ওগুলোর বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত। মাস্ট বলে কিছু নেই একটারও। শিলাঝড়ে চুরমার হয়ে গেছে কেবিনের

সমস্ত কাঁচ।

লো গিয়ারে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। ওর ধারণা হোটেলটা এদিকেই কোথাও হবে। এই ওয়াটারফ্রন্ট পুন্টারেনাসের প্রাণকেন্দ্র, কাজেই শহরের গুরুত্বপূর্ণ যা কিছু আছে, সব এখানে থাকাই স্বাভাবিক।

'ওই হোটেলই যদি কবীর চৌধুরীর ঘাঁটি হয়,' সোহানা বলল। 'তাহলে গেটে নিশ্চই গার্ড থাকবে। ওদেরকে কি বলব আমরা?'

'বলব, আমরা সৌখিন ফ্লাইয়ার,' বলল ও। 'আকাশে উঠে হঠাৎ ঝড়ের মুখে পড়েছি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এদিকে এসে পড়েছি।'

'ওরা বিশ্বাস করবে না।'

'হয়তো না,' মাথা চুলকাল রানা। 'তবু, এ ছাড়া আর কি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা থাকতে পারে এরকম সময়ে কারও এদিকে এসে হাজির হওয়ার?'

'কিন্তু কবীর চৌধুরী যদি আমাদের ব্যাপারে আগে থেকে নিজের লোকজনকে সতর্ক করে দিয়ে থাকে?'

'সে সম্ভাবনা কম। আমার ধারণা এরকম পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত ছিল না লোকটা, কাজেই বাজে ওয়েদারে দূরের সাথে যোগাযোগ রক্ষার কার্যকর কোন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা সম্ভবত চিন্তাই করেনি। যদি সেরকম কিছু ব্যবস্থা থাকেও, মূল ঘাঁটিতে আছে সেটা। আই মীন, ছিল। এখন নেই। ধ্বংস হয়ে গেছে। তারওপর লোকটা এমুহূর্তে মোবাইল। অতএব...'

একটা সীম্যানস' ক্যান্টিনা দেখে বুইক দাঁড় করাল ও। ধোঁয়া উড়ছে ওটার চিমনি দিয়ে। বন্ধ কাঁচের জানালায় আগুনের লালচে আভা। 'ভেতরে মনে হচ্ছে মানুষ আছে। চলো, হোটেলটা কোনদিকে জেনে আসি।'

'আমি যাচ্ছি,' দরজা খুলে ফেলল সোহানা। 'তুমি থাকো।'

মাঝখানের কয়েক গজের দূরত্ব দৌড়ে পেরিয়ে গিয়ে ক্যান্টিনার উঁচু কাঠের বারান্দায় উঠল সোহানা। রানা কবীর চৌধুরীর কথা ভাবল। সত্যিই কি ওদের ব্যাপারে নিজের লোকদেরকে সতর্ক করে দিয়েছে সে? হয়তো দিয়েছে। তবু যেতে হবে ওদেরকে। না গিয়ে উপায় নেই।

ফিরে এসে গাড়িতে উঠল সোহানা। গম্ভীর গলায় বলল, 'ঠিক পথেই যাচ্ছি আমরা। আরেকটু সামনে গিয়ে বাঁয়ে যেতে হবে,' ঘাড় ঘুরিয়ে ক্যান্টিনার দিকে তাকাল এক পলক।

'অবস্থা কেমন দেখলে?' গাড়ি ছাড়ল রানা।

'ভয়ঙ্কর! আশেপাশের সবাই এসে আশ্রয় নিয়েছে ওখানে। খিদের জ্বালায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাঁদছে, অথচ খাবার নেই। একজন বলল, ক্যাথেড্রালে আরও বেশি লোক আশ্রয় নিয়েছে। সেখানকার অবস্থা নাকি খুবই শোচনীয়। কাল থেকে কিছু খেতে পায়নি তারা।'

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল ও, গিয়ার শিফট করে প্রশস্ত, নির্জন বুলেভারে উঠে এল। দুশো গজমত এগোতেই হোটেলটার দেখা পাওয়া গেল। যেমন বড়, তেমন অবিশ্বাস্যরকম সুন্দর ওটা। বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল করছে। সামনে অনেকখানি জায়গা নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার ড্রাইভ। নিচের দুই ফ্লোর সামনের দিকে অনেকখানি করে বেরিয়ে আছে। ওগুলো সানডেক, এ মুহূর্তে জমাট বাঁধা বরফের সুইমিং পুলে পরিণত হয়ে আছে। উঁচু পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা হোটেলটা। মেইন গেট খোলা।

'এখানেই আছে ট্রান্সমিটার,' বলল ও।

পঞ্চাশ ফুট ভেতরে ড্রাইভওয়ে আগলে দাঁড়িয়ে আছে একটা ফিয়াট কুপে। এগজস্ট পাইপ থেকে ধোঁয়া বেরচ্ছে। জানালার কাঁচ ঝাপসা, ভেতরটা দেখার উপায় নেই। রানা হর্ন বাজাতেই ওটার প্যাসেঞ্জারস' ডোর খুলে এক লোক বেরিয়ে এল। হাতে সাব-মেশিনগান। তার পিছনে আরেকজনকে দেখতে পেল ওরা,

ড্রাইভিং সীট থেকে চোখ কুঁচকে এদিকে তাকিয়ে আছে। প্রথমজন অস্ত্র বাগিয়ে ধরে রানার জানালার কাছে এসে দাঁড়াল।

'সেনিয়র?' সন্দিগ্ধ চেহারায় বলল লোকটা।

'আপনাদের গাড়ি সরান, প্লীজ,' রানা বলল। 'আমরা হোটেলে যাব।'

'সরি, সেনিয়র। নতুন কোন গেস্ট অ্যালাও করছি না আমরা।'

চোখ কোঁচকাল ও। 'আপনারা সিকিউরিটি?'

'অ্যাঁ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, সিকিউরিটি।'

হারামজাদা! মনে মনে বলল রানা, মিথ্যে কথাটাও বলতে শেখোনি। 'দেখুন, আমরা খুব বিপদে পড়ে এসেছি। আমরা দু'জনেই অ্যামেচার পাইলট, প্লেন চালানো শিখছি।'

'তো?' বলল লোকটা। দৃষ্টি ঘন ঘন স্থান বদল করছে তার। একবার ওকে, একবার সোহানাকে দেখছে।

বানানো গল্পটা এরমধ্যে খানিকটা ঘষেমেজে রেখেছিল রানা, যথাসম্ভব বিশ্বাসযোগ্যভাবে সেটা বলে গেল।

'হুয়ান, কারা ওরা?' বলতে বলতে দ্বিতীয়জন নেমে এল গাড়ি থেকে। চোখ সেঁটে আছে সোহানার ওপর। 'কি বলে?'

স্প্যানিশে রানার সমস্যার কথা খুলে বলল হুয়ান। শুনে চুক্ চুক্ ধরনের শব্দ করল তার সঙ্গী। 'কোত্থেকে আসছেন আপনারা?'

'পানামা সিটি,' রানা বলল।

'নাম?'

'আমি মিগুয়েল কার্থেজ। আর এ আমার বান্ধবী, সেনিয়রিটা ফান্দাঙ্গো।'

'প্লেনটা কোথায়?'

বলল রানা। 'অপেক্ষা করুন,' বলে গাড়ির কাছে ফিরে গেল লোকটা। ড্যাশবোর্ড থেকে একটা ওয়াকি-টকি বের করে কথা

বলতে লাগল। এক মিনিট পর ওটা জায়গায় রেখে সঙ্গীর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল সে, গাড়ি সরিয়ে নিল এক পাশে।

ধীরগতিতে ওটাকে অতিক্রম করে এগোল রানা। কার পার্কে অনেকগুলো গাড়ি দেখা গেল, ওর মধ্যে বুইক রেখে নেমে পড়ল। সোহানার হাত ধরে কাঁচের প্রকাণ্ড মেইন ডোরের দিকে পা বাড়াল। ডোরম্যান নেই দেখে অবাক হলো না ওরা। ডেস্ক ক্লার্ক ছাড়া লবিতেও কেউ নেই। চেকইন কাউন্টারের শেষ মাথায় এক যুবক বসা। ষাঁড়ের মত স্বাস্থ্য তার, আকৃতি গরিলার মত। তার পিছনে রুমের চাবি ও মেইল রাখার বড় পিজিয়ন হোল, বাঁ দিকে একটা ছোট সুইচ বোর্ড। ভেতরের পরিবেশ উষ্ণ। এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবস্থা চালু আছে।

যুবকের সামনের রোজউডের চক্চকে কাউন্টারের নিচে খুব সম্ভব আরেক সেট ওয়াকি-টকি আছে, ভাবল রানা। কারণ চাউনি দেখে বোঝা যাচ্ছে ওদের অপেক্ষায় ছিল সে। যুবকের দিকে এগোল ওরা। কয়েক পা এগিয়েছে, এমন সময় তার পিছনের এক দরজা খুলে গেল, আরেক লোক বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। এ-ও পেশীবহুল, তবে প্রথমজনের তুলনায় বেশ বয়স্ক।

স্ট্রাইপড় প্যান্ট পরে আছে লোকটা, কোটের বাটন হোলে ম্যানেজারের কার্নেশন। 'ও যদি ম্যানেজার হয়,' ঠোঁট না নেড়ে বিড়বিড় করে বলল রানা। 'আমি তাহলে জর্জ ওয়াশিংটন।'

'হোটেলটা এখন কবীর চৌধুরীর কব্জায়,' সোহানা বলল।

'অবশ্যই। তার প্রথম ডিফেন্স লাইন সবে পেরিয়েছি আমরা, আরও কতগুলো বাকি কে জানে?'

কাউন্টারে কনুই রেখে দাঁড়াল ম্যানেজার। কোনরকম ভদ্রতার ধার না ধেরে বলে উঠল, 'কার্থেজ আর ফান্দাঙ্গো?'

'হ্যাঁ,' রানা মাথা ঝাঁকাল।

'কোত্থেকে এসেছেন আপনারা?'

আরেকবার গোটা গল্পটা বলতে হলো ওকে, কিন্তু ম্যানেজার

তাতে প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হলো না। গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল। 'কি ধরনের ক্ষতি হয়েছে প্লেনের?'

সোহানা বলল, 'তেল ফুরিয়ে গেছে। আর এই ওয়েদারে ওড়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে, ইউ নো।'

'দেখুন, আমাদের এখানে একদল ডেলিগেট আছে। থাকার জায়গা নেই,' বলল লোকটা। 'তবু, বিপদে পড়েছেন শুনে আমি আপনাদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছি। কিন্তু তা শুধু আজকের জন্যে। কাল চলে যেতে হবে আপনাদেরকে।'

'কিন্তু এই ওয়েদারে...' এক কথায় মেনে নিলে সন্দেহ দেখা দিতে পারে বলে আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু থামিয়ে দিল ম্যানেজার।

'স্টপ, স্টপ! এ নিয়ে আর কোন কথা শুনতে চাই না। পেদ্রো,' গরিলার দিকে ফিরল সে। 'এদেরকে রুমে নিয়ে যাও।'

'সি, সেনিয়র,' উঠে পড়ল যুবক। 'কোন রুমে?'

'পিছনদিকে একটাই রুম আছে,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল লোকটা। 'তুমি জানো।'

'সি, সি,' ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগল গরিলা। পিছনের পিজিয়ন হোল থেকে একটা চাবি তুলে নিয়ে কাউন্টারের এপাশে এসে ওদের উদ্দেশে বলল, 'আসুন।'

তার পিছন পিছন চলল রানা ও সোহানা। দুই সারি এলিভেটরের মাঝখান দিয়ে অন্য পাশের বড়, গোল লাউঞ্জ এরিয়ায় এসে পড়ল। সাদা রঙের সার্কুলার সোফা, চেয়ার-টেবিল ও চওড়া, গোল পিলারে ভর্তি জায়গাটা। একদিকের বড় কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরের সানডেক দেখা যায়, অন্যদিকে ককটেল লাউঞ্জে যাওয়ার ফানেলের মত রাস্তা।

ফানেলের মুখে বিশাল এক ব্যানার ঝুলছে, তাতে বড় বড় সোনালী অক্ষরে লেখা: WELCOME, SAINTS OF THE TRUE FUNDAMENTAL GOSPEL CHURCH.PIETY–

CHASTITY-SOBRIETY.-PURITY.MAY YOUR STAY BE BLESSED.

'ওখানে একটুপর নাচের আসর বসবে,' হাত তুলে ককটেল লাউঞ্জ দেখাল পেদ্রো।

সেদিক থেকে একাধিক গলার জোর হাসির শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল রানা। 'কারা ওখানে?'

'কারা আবার!' পেদ্রো বলল। 'গসপেল চার্চের সেইন্টরা। নরটি আমেরিকানোস, সেনিয়র। রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড স্যালভেশন ক্রুজে বেরিয়ে বাজে ওয়েদারে ফেঁসে গেছে।'

'কি স্যালভেজ করতে এসেছে ওরা?' সোহানা বলল।

পেদ্রো শ্রাগ করল। 'পাপীদেরকে, সেনিয়রিটা। তাদেরকে ধর্মের পথে কনভার্ট করতে।'

'তাদের জন্যে নাচ?' রানা হাসল। 'নিজেরাই কনভার্টেড হয়ে গেছে মনে হচ্ছে?'

গরিলার মুখেও হাসি ফুটল। 'এই অঞ্চলের সেরা শিল্পী কারমেন ডি লাবাম্বা নাচবে আজ। দেখতে পাবেন।'

পিছন থেকে নিজের নাম শুনে ঘুরে তাকাল পেদ্রো। রানা-সোহানাও ঘুরল। দেখল ম্যানেজার, এক কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দুজনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গরিলাকে চাপা গলায় কিছু বলল সে। কয়েকবার ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল যুবক, তারপর ফিরে এল ওদের কাছে।

'কোন সমস্যা হয়েছে?' রানা প্রশ্ন করল।

'না। আসুন,' গম্ভীর চেহারায় বলল যুবক।

'তাহলে...'

'আর কোন প্রশ্ন নয়, সেনিয়র। আসুন,' শীতল, দূরাগত কণ্ঠে বলে আগে আগে চলল সে। ওদের জন্যে নির্দিষ্ট রুমের দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল। ইঙ্গিতে ভেতরে যেতে বলল ওদেরকে।

'এদের হলো কি?' রুমে পা রেখে চাপা গলায় বলল সোহানা। 'কিছু সন্দেহ করল নাকি?'

মুখ খুলতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু পিছনে দড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে ঘুরে তাকাল। দরজার নব ধরে ঘোরাতে চেষ্টা করল—ঘুরছে না। লক করে দিয়ে গেছে পেদ্রো। 'কুত্তার বাচ্চা!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ও। 'মনে হচ্ছে তাই।'

রুমের ওপর নজর বোলাল ও। ছোট রুম, দেয়াল ও সীলিঙে ক্রীম রঙের সিল্কি পেইন্ট। একটা চেয়ার, একটা ডেস্ক, একটা ব্যুরো আর একটা ডবল খাট, এই হলো আসবাব। ছোট একটা বাথরুম আছে রুমের সাথে। একদিকের দেয়াল কাঁচের স্লাইডিং ডোরের, তার ওপাশে টেরেস। পুরু হয়ে তুষার জমে আছে টেরেসে। বাতাসের চাপে স্লাইডিং ডোর থেকে থেকে প্রবল ঝাঁকি খাচ্ছে।

ওটার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। ডানে-বাঁয়ে তাকাল। ডানদিকে, মনে হলো হোটেল ভবন থেকে আলাদা একটা ছোট বিল্ডিং। এতই কাছাকাছি যে কাঁচে গাল ঠেকিয়ে তাকালে দেখা যায়। কিচেনের এক্সটেনশন ওটা। আলো জ্বলছে। এক্সটেনশনের শেষ মাথা অন্ধকার। মুখ সরিয়ে আনছিল ও, হঠাৎ ওখানে 'ম্যানেজারকে' উদয় হতে দেখে থেমে গেল। আরও দু'জনকে দেখা গেল তার সাথে। সশস্ত্র গার্ড ওরা।

একটা টেবিল ঘিরে বসল লোকগুলো, ম্যানেজার বসল না। রানার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছে। হাত-মাথা অনবরত নড়ছে তার। একটুপর মোটা এক বৃদ্ধা লাঞ্চ নিয়ে এল গার্ডদের জন্যে। একযোগে হামলে পড়ল তারা প্লেটের ওপর। খাওয়া শেষ হতে আবার এল মহিলা, বাসন-কোসন তুলে নিয়ে টেবিল পরিষ্কার করে রেখে গেল। তখনও কথা বলছে ম্যানেজার।

এক সময় থামল সে, ঘুরে পা বাড়াল। গার্ডরাও উঠে পড়ল।

অন্ধকার হয়ে গেল রুম। এক মিনিট পর এক্সটেনশনের অন্ধকার শেষ মাথায় আলো জ্বলে উঠল–ওটা আরেকটা রুম।

প্রথমেই যে জিনিসটার ওপর রানার চোখ পড়ল, সেটা হচ্ছে পুরু ওক কাঠের একটা দরজা–সব ধরনের হেভি ডিউটি হার্ডওয়্যার ফিটিংসওয়ালা। ওয়াক-ইন স্টোরেজ বা মীট লকারের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় ওরকম দরজা।

'কি বুঝলে?' পাশে দাঁড়ানো সোহানার কাঁধে এক হাত রাখল ও।

'ওই দরজার ওপাশে রয়েছে কবীর চৌধুরীর ইন্সটলেশন,' সোহানা বলল। 'রিফ্রিজারেশন সিস্টেম অফ করে দিলে ভেতরের সমস্ত পাইপিং আর কনডুইট ট্রান্সমিশন গ্রিডে পরিণত হবে।'

গার্ডদের দেখতে পেল রানা। দরজাটার কাছে রাখা ছোট এক টেবিল ঘিরে বসে পড়ল লোক দুটো, একজন তাস বাঁটতে শুরু করল।

'ওই রুমে যেতে হবে,' আপনমনে বলল রানা। 'কিন্তু... কিভাবে যাই?'

এক মুহূর্ত পর দরজায় মৃদু 'কুট!' শব্দ হতে স্লাইডিং পার্টিশনের কাছ থেকে ছিটকে সরে এল ওরা। পরমুহূর্তে দরজা খুলে গেল। দোরগোড়ায় বড় এক ট্রে হাতে সেই বুড়িকে দেখা গেল, লাঞ্চ নিয়ে এসেছে ওদের জন্যে। তার পিছনে 'ম্যানেজার'। রানার সাথে চোখাচোখি হতে তেতো খাওয়া হাসি ফুটল লোকটার মুখে।

'সরি, সেনিয়র,' বলল সে। 'রুমে আটকে রেখে আপনাদেরকে হয়তো অসুবিধেয় ফেলে দিয়েছি। কিন্তু কিছু করার নেই। আপনাদের পরিচয় সম্পর্কে শিওর হতে পারলে এই বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হবে।'

'পানামা থেকে যে ক্লাবের প্লেন নিয়ে এসেছি,' সোহানা বলল। 'চাইলে তাদের ফোন নম্বর দিতে পারি। ওখানে ফোন

করলেই...'

'না, না,' হেসে বাধা দিল ম্যানেজার। 'এখনই অতদূরে যেতে চাই না আমি। তাছাড়া এই ওয়েদারে সেটা সম্ভব হবে বলেও মনে হয় না। যেখানে আপনারা ল্যান্ড করতে বাধ্য হয়েছেন বললেন, সেখানে সত্যিই কোন প্লেন আছে কি না আপাতত এটুকু জানলেই আমার চলবে। লোক পাঠিয়েছি আমি দেখে আসতে। সে ফিরলেই...' শ্রাগ করল লোকটা। 'খেয়ে নিন দয়া করে। ও পরে এসে টেবিল পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে, ওকে?'

বুড়িকে বেরিয়ে যেতে ইঙ্গিত করে নিজেও বের হয়ে গেল ম্যানেজার। 'কুট!' শব্দে লক্ হয়ে গেল দরজা।

বারো

এদের ককটেল লাউঞ্জ অ্যাম্ফিথিয়েটারের মত গোল, নাম এল কোইউনটুরা। হাতে নক্শা তোলা মেহগনি কাঠের প্রকাণ্ড এক বার আছে এখানে। নানান পানীয়ের বোতলে ঠাসা। বারটেন্ডার মানুষটা প্রৌঢ়–যেমন মোটা, তেমনি খাটো। তিনটে ভাষায় কথা বলতে পারে সে, তিনটেই যেনতেন ভাবে।

ব্রাস রেইল নেই বারে, তার বদলে আছে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের রেইল। তার ভেতরে আছে আরেকটা নিয়ন টিউব, টকটকে লাল রঙের আলো ছড়ায়। বারের এক মাথায় ছোট ছোট কিছু বুদ আছে। গোটা লাউঞ্জ হাল্কা হলুদ রঙের ওয়াল পেপারে মোড়া।

ডান্স ফ্লোরটা গোল, ছোট। তার সাথে বাদকদের বসার জন্যে

একটা স্টেজ। ফ্লোর ঘিরে অনেকগুলো গোল টেবিল সাজিয়ে রাখা। এ মুহূর্তে ওগুলোর প্রত্যেকটা দখল হয়ে আছে। মিউজিশিয়ানদের জনপ্রিয় 'মামা লুকা বূ বূ' গানের সুরের ছন্দে দুলছে গসপেল চার্চের সেইন্টরা। কেউ কেউ নাচও জুড়ে দিয়েছে। কালো রঙের ডীকন স্যুট ও স্ট্রিং টাই পরে আছে তারা। বেশি পান করে ফেলায় কারও কারও চেহারা ফ্যাকাসে লাগছে।

মহিলাদের বেশিরভাগের চেহারা-সুরত আরও খারাপ। গলা থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ঢাকা বিভিন্ন ধরনের ড্রেস পরে আছে তারা। কোন কাটছাঁট নেই ওগুলোর, পাশ বালিশের খোলের মত। ঝড় আর মিউজিকের শব্দ ছাপিয়ে চড়া গলায় কথা বলছে, হাসছে। ভয়তাড়িত হাসি। আজই জীবনের শেষ দিন ভেবে গসপেল চার্চের শিক্ষা ভুলে গেছে তারা, পুরুষদের তুলনায় বেশি গিলছে।

বাইরে ভয়াবহ গর্জন চলছে বাতাসের। একটু পরপরই গাছের ভাঙা ডাল, পাথর বা এটা-সেটা উড়ে এসে আছড়ে পড়ছে হোটেলের গায়ে। বিল্ডিং কাঁপছে, পানীয় দুলছে গ্লাসের মধ্যে। কারমেন লাবাম্বার দেখা পাওয়ার আশায় দৃষ্টি চকচক্ করছে পুরুষ সেইন্টদের।

এদিকে, একই মুহূর্তে নিজেদের রুমে পায়চারি করছে মাসুদ রানা। চেহারায় উদ্বেগ। সোহানা বসে আছে খাটের কোনায়। গরিলা পেদ্রোর পাহারায় বুড়ি এসে লাঞ্চের এঁটো প্লেট-ডিশ নিয়ে গেছে প্রায় দু'ঘণ্টা আগে, সেই থেকে আর কোন খবর নেই কারও। প্লেনটা জায়গামত আছে কি না দেখে আসতে এত সময় লাগতে পারে না, কাজেই সন্দেহে ভুগতে শুরু করেছে রানা। অস্থির পায়ে স্লাইডিং পার্টিশনের কাছে এসে দাঁড়াল ও, চোখ কুঁচকে ঝড়ের তাণ্ডব দেখল কিছুক্ষণ।

এটা-সেটা উড়ছে অনবরত, ভয়ঙ্কর গতিতে এদিক-সেদিক করছে। ওসবের যে কোন একটা যে কোন মুহূর্তে এসে আছড়ে

পড়তে পারে পার্টিশনের ওপর। এখনও যে তেমন কিছু ঘটেনি, সেটাই বরং বিস্ময়কর মনে হচ্ছে।

'নাহ্, আর অপেক্ষা করা যায় না,' বলে উঠল ও। 'তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করা দরকার। আরও একটা স্টেশন এখনও বাকি।'

উঠে ওর কাছে এসে দাঁড়াল সোহানা। 'কি করবে ভাবছ?'

'ভাবছি এটা খুলে বেরিয়ে পড়ব,' স্লাইডিং পার্টিশন দেখাল রানা।

'কিন্তু যদি ম্যানেজার বা পেদ্রো এসে পড়ে?'

'সেটাই তো ভাবছি,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল ও। 'আমাকে রুমে না দেখলে ওরা অবশ্যই সন্দেহ করবে। আবার বসে থাকলেও সমস্যা। তাই...ভাবছি...' দরজায় খুট্ শব্দ হতে থেমে গেল, ঘুরে তাকাল ঝট্ করে।

খুলে গেল দরজা। ম্যানেজার দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। 'দুঃখিত, সেনিয়র,' রানার সাথে চোখাচোখি হতে হাসির ভঙ্গি করল লোকটা। 'আমার লোক ফিরতে একটু দেরি করে ফেলেছে। আপনাদের প্লেনটা দেখে এসেছে ওরা।'

'তার মানে আর বন্দী হয়ে থাকতে হবে না আমাদেরকে?' সোহানা বলল। ভেতরে ভেতরে উল্লসিত।

'নিশ্চই, সেনিয়রিটা। আর বন্দী হয়ে থাকতে হবে না।'

'শুনেছি কক্‌টেল লাউঞ্জে নামকরা এক ডান্সারের নাচ আছে আজ,' রানা বলল। 'আমরা দেখতে যেতে পারি?'

'হোয়াই, অফকোর্স! একটু পর শুরু হবে নাচ। ইচ্ছে করলে অবশ্যই আসতে পারেন।' বাজ পড়ার বিকট শব্দে কেঁপে উঠল হোটেল। কামান দাগার মত গম্ভীর, গুম্ গুম্ করতে করতে মিলিয়ে গেল আওয়াজটা।

ম্যানেজার চলে যেতে সোহানার সাথে নিচু গলায় কিছুক্ষণ কথা বলল রানা, তারপর একসাথে বেরিয়ে এল দুজনে। হাত ধরাধরি করে এগোল ককটেল লাউঞ্জের দিকে। ভেতরের অবস্থা

দেখে হাসল রানা মনে মনে। 'বাহ্,' নিচু গলায় বলল। 'মনে হচ্ছে পরকালে ঈশ্বর প্রতিশ্রুত স্বর্গে বসে সুধা টানছে ব্যাটারা!'

'মেয়েগুলো ভারি অসভ্য তো!' সোহানা বলল।

'আহা, ওভাবে বলছ কেন? জীবনে আজই হয়তো প্রথম এরকম সুযোগ পেয়েছে।' দূর থেকে গরিলাকে হাত নাড়তে দেখে পাল্টা হাত নাড়ল রানা। 'চলো, বসা যাক্ কোথাও।'

খুঁজেপেতে একটা কর্নার টেবিল বের করে বসল ওরা। স্টেজ ও ডান্স ফ্লোর থেকে...বেশ দূরে ওটা, দেয়ালের কাছে। এখান থেকে স্টেজের পুরোটা দেখা যায় না। মিউজিক থেমে গেল হঠাৎ করে। সামনে তাকাতে স্টেজে ম্যানেজারকে দেখতে পেল ওরা। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। নীরব হয়ে গেছে লাউঞ্জ। সেইন্টদের হুল্লোড় মৃদু গুঞ্জনে পরিণত হয়েছে।

'ই আহোরা, দামাস ই কাবালেরোস,' স্প্যানিশে শুরু করল সে। 'লা সেনিয়রিটা কারমেন লাবাম্বা! মিউই সেলিব্রি...!'

হাত তালির বিকট আওয়াজে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড় হলো ওদের। একটা-দুটো তীক্ষ্ণ শিসও বেজে উঠল, সঙ্গে চাপা হাসি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে এসে হাজির হলো কারমেন। বিশ-একুশ বছর বয়স হবে মেয়েটির। হালকা-পাতলা, তবে ভরাট দেহ। উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন। মুখের আকৃতি ডিমের মত। খাড়া নাক, বড় বড় চোখ। গায়ের রং একটু চাপা। ঘন কালো, দীর্ঘ চুল মাথার চুড়ো খোঁপা করে বাঁধা। এমনিতেই দারুণ সুন্দরী, তার ওপর আগুনে লাল রঙের 'ভি' কাট্ গাউনে ডানাকাটা পরীর মত লাগছে মেয়েটিকে। ঝুঁকে দর্শকদের অভিবাদন জানাল সে। প্রয়োজনের তুলনায় সময় একটু বেশি নিল যাতে 'ভি'র ভেতরের প্রায় সবটুকুই দেখতে পায় দর্শকরা।

আরেক দফা হাততালি শুরু হলো। সাথে অনুষঙ্গ হিসেবে থাকল শিস। এবার অনেকগুলো শিস বাজল। ট্রাম্পেটের আওয়াজ উঠল। ওটা থামতেই বিচ্ছিরি 'হিক!' শব্দে হিক্কা তুলল

কেউ। স্ট্রিপারের মত দীর্ঘ পায়ে ডান্স ফ্লোরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল মেয়েটি, আড়মোড়া ভেঙে পুরুষ সেইন্টদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে শুরু করল নাচ। ধীর ছন্দে।

কোটের পকেট থেকে সিগারেট বের করার ফাঁকে ম্যানিলা রোপের টুকরোটা আছে কি না দেখে নিল রানা। বাথরূম আর ল্যাট্রিনের মাঝের পর্দার দড়ি ওটা, ফুট তিনেক কেটে নিয়ে এসেছে প্রয়োজন হবে বলে। চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল ও। সবার চোখ সেঁটে আছে কারমেনের ওপর, ভুলেও অন্য কোনদিকে তাকাচ্ছে না কেউ। কারণ ছন্দ ক্রমে দ্রুততর হচ্ছে তার, বুক আর নিতম্বের দোল বাড়ছে। ওরই মধ্যে এক হাত পিছনে নিয়ে গাউনের কোমর পর্যন্ত লম্বা যিপার একটানে খুলে ফেলল সে, দুই দর্শনীয় ঝাঁকিতে হাত দুটো বের করে নিল।

কোমরের কাছে নেমে দলা হয়ে থাকল গাউন। দুই বুড়ো আঙুল দিয়ে ওটা খুলে ফেলার উদ্যোগ নিল কারমেন। ব্রা পরা বুক ঘন ঘন ওঠানামা করছে তার, ঘামে চকচক করছে গা। একটু থেমে গাউন ফেলে দিল মেয়েটি, একটা গ্লাস ভাঙল কোথাও। প্যান্টি আর ব্রা পরা কারমেনের ফিগারের প্রশংসা করল রানা মনে মনে।

আবার শুরু হলো নাচ। কয়েক মুহূর্তের জন্যে থেমে ছিল মিউজিক, ফের বেজে উঠল ঐতিহ্যবাহী রাম্বা-টাম্বার উদ্দাম ছন্দে। গোটা লাউঞ্জ অনড়, পলক পড়ছে না দর্শকদের চোখে। দম বন্ধ করে স্টেজের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। সময় হয়েছে বুঝে সোহানার হাতে মৃদু চাপড় মারল রানা, নিচু কণ্ঠে বলল, 'চললাম। রেডি থেকো।'

'সাবধানে,' স্টেজ থেকে চোখ না সরিয়ে বলল সোহানা।

দেয়াল ঘেঁষে এগোল রানা। মুখ স্টেজের দিকে ঘুরিয়ে রেখে নাচ দেখার ভান করছে, আসলে ম্যানেজার ও পেদ্রোকে খুঁজছে। কোথাও দেখা গেল না তাদের। বেশ খানিকদূর এগিয়ে বাঁ দিকে

একটা সরু করিডর দেখতে পেয়ে সুড়ুৎ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। কয়েক ঘণ্টা আগে এটা দিয়েই মেইন হল থেকে ককটেল লাউঞ্জে পৌঁছেছিল ওরা। আরেকবার পিছনদিকে নজর বুলিয়ে নিশ্চিত হয়ে কিচেনের উদ্দেশে পা বাড়াল। কিন্তু কয়েক পা যেতেই পিছন থেকে একটা গলা ডেকে উঠল, 'সেনিয়র! কোথায় যাচ্ছেন?'

মুহূর্তের জন্যে কাঁধের পেশী আড়ষ্ট হয়ে উঠল ওর। ঘুরে দাঁড়াল। পেদ্রো দাঁড়িয়ে আছে ওর কয়েক হাত পিছনে, ডান হাত প্যান্টের পকেটে। হারামজাদা ছিল কোথায় এতক্ষণ? ভাবল মনে মনে। 'আহ্, ইয়ে,' হাসির ভঙ্গি করল ও। 'বাথরুমে যাব...'

'বাথরুম? চলুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি,' ওর পাশ ঘেঁষে সামনে চলে গেল লোকটা। 'এই দিকে।'

তাকে অনুসরণ করে করিডরের শেষ মাথায় এসে বাঁয়ে ঘুরল ও। তাকিয়ে দেখল সামনেই সিটিং লাউঞ্জ। এ মুহূর্তে কেউ নেই এখানে। একদম ফাঁকা। কিচেন এখান থেকে বেশি দূরে নয় বুঝতে পেরে চাপা উত্তেজনা অনুভব করল রানা। লাউঞ্জের শেষ মাথায় এসে থেমে পড়ল পেদ্রো, মুখ উঁচু করে বাঁ দিকের আরেকটা করিডর দেখিয়ে বলল, 'ভেতরে। যান, আমি আছি এখানে।'

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে করিডরে ঢুকে পড়ল রানা। চার-পাঁচ পা যেতে ডান দিকে একটা ব্যাটউইং দরজার ওপর 'ল্যাভেটরি' লেখা দেখতে পেল। ভেতরে ঢোকার আগে পিছনে তাকাল একবার, পুরো করিডর জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে গরিলা, ডান হাত এখনও পকেটে। চোখাচোখি হতে অধৈর্য ভঙ্গিতে অন্য হাত নাড়ল সে। 'তাড়াতাড়ি করুন, সেনিয়র, পার ফেভর!'

মাথা ঝাঁকিয়ে ভেতরে চলে এল রানা। এসেই ব্রেক কষল, ব্যাটউইং ডোরের নিচ দিয়ে সাবধানে উঁকি মেরে তাকাল। ব্যাটা একই ভঙ্গিতে এদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে দেখে কি করবে

ভাবতে লাগল। কিন্তু বেশি মাথা ঘামাতে হলো না, কয়েক সেকেন্ড পর পেদ্রো নিজেই ওর সমস্যার সমাধান করে দিল। ঘুরে দাঁড়াল সে। একপাশে সরে সিটিং লাউঞ্জের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল, পিছিয়ে এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। তার প্রশস্ত বাঁ কাঁধ ও মাথার একটা অংশ দেখতে পাচ্ছে রানা।

পকেট থেকে দড়িটা বের করল ও, ব্যাটউইং ডোরের নিচ দিয়ে বেরিয়ে এসে দ্রুত, বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে এগোল। চাউনিতে হত্যার প্রত্যয়। সময়মত হাত যাতে পিছলে না যায়, সে জন্যে দড়ির দুই মাথায় বড় করে মজবুত গিঁঠ দিয়ে নিয়েছিল রানা। সে দুটো মুঠোর বাইরের প্রান্তে রেখে একটা করে প্যাঁচ দিয়ে দু'হাতে দড়িটা ধরল, মুহূর্তে পৌঁছে গেল পেদ্রোর দু'হাতের মধ্যে।

শেষ মুহূর্তে ঘুরে তাকাতে যাচ্ছিল যুবক, তখনই গলায় ফাঁসটা পড়ল। ওটা পরিয়েই দু'হাতে হ্যাঁচকা টান মারল রানা, সঙ্গে সঙ্গে জিভ বেরিয়ে পড়ার জোগাড় হলো পেদ্রোর। আতঙ্কিত হয়ে সিগারেট ফেলে দড়ি ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে; কিন্তু সুযোগ পেল না, আরেক হ্যাঁচকা টানে তাকে ভেতরে নিয়ে এল রানা। ওরইমধ্যে লাউঞ্জে চোখ বুলিয়ে নিয়েছে, কেউ নেই—ফাঁকা। ভারী দেহটা টেনে ল্যাভেটরিতে নিয়ে এল ও।

হাত-পা অসাড় হয়ে ওঠার আগমুহূর্ত পর্যন্ত মরিয়া হয়ে যুঝল পেদ্রো, কিন্তু বৃথা গেল সমস্ত প্রচেষ্টা। গলা কেটে বসে গেল ম্যানিলা রোপ, একটু পর ভেতরে চাপা ফট! শব্দে কিছু একটা ভাঙল, পরমুহূর্তে মাথা সামনের দিকে ঝুলে পড়ল তার। শক্তি খাটাতে গিয়ে কাঁধের ক্ষতস্থানে ব্যথা লাগছে রানার, সরু দড়িতে ওরও হাত কেটে যাচ্ছে, তবু ছাড়ল না। আরও কিছুক্ষণ পর পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে তবে ছাড়ল।

টেনে হিঁচড়ে একটা কিউবিক্‌লের মধ্যে এনে কমোডের ওপর

বসিয়ে দিল মৃতদেহটা। বেকায়দা ভঙ্গিতে ঘাড় কাত করে বসে থাকল পেদ্রো। গোলাপী জিভের অনেকখানি বেরিয়ে আছে, বিস্ফারিত চোখ রানার ওপর স্থির। দড়ি পকেটে রেখে তার প্যান্টের পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে আনল ও। একটা অটোম্যাটিক ওটা, ট্রেজো পয়েন্ট টুটু। অস্ত্রটা ফুল লোডেড দেখে খুশি হয়ে উঠল মন।

বেরিয়ে এল রানা। ডানে-বাঁয়ে তাকাল, কোথাও কেউ নেই। ককটেল লাউঞ্জ থেকে দ্রুতলয়ের মিউজিক ভেসে আসছে, তবে আওয়াজটা স্পষ্ট নয়। ঝড়ের তাণ্ডবে অনেকটাই চাপা পড়ে যাচ্ছে। উল্টোদিকে এগোল ও ব্যস্ত পায়ে, কোটের ডান পকেটে হাত, তর্জনী পেদ্রোর ট্রেজোর ট্রিগারের ওপর। সদা প্রস্তুত।

ডাইনিং রুমে এসে পৌঁছল রানা। এটাও ফাঁকা।

তবে সবগুলো টেবিল ডিনারের জন্যে রেডি। ওর মধ্যে দিয়ে সহজ ভঙ্গিতে এগোল ও, রুমের আরেক মাথায় পৌঁছে কিচেন আর ডাইনিং রুমের মধ্যেকার সার্ভিস অ্যালিতে পৌঁছল। কোমর সমান উঁচু একটা কাউন্টার আছে এখানে, বিল্ট-ইন সিঙ্ক ও ফসেট আছে তার সাথে। ওটার পাশেই কিচেনে যাওয়ার দরজা, ভেতর থেকে বন্ধ। সিঙ্কের নিচের দিকে কাটলারিজ রাখার শেলফ। কাউন্টারের পাশে রয়েছে বড়সড় লিনেন ক্লজিট, টাওয়েল আর টেবিলক্লথে ভর্তি। সেসবের সাথে ঝাড়ু, ফ্লোর মোছার মপ আছে বেশ কিছু। আর আছে চার লিটারের একটা ফ্লোর ওয়াক্সের ক্যানও।

কিচেন থেকে নারী, পুরুষের গলা ভেসে আসছে। ধাতব প্যানে গ্লাস-প্লেটের ঠোকাঠুকির আওয়াজও।

পরবর্তী করণীয় নিয়ে কিছুক্ষণ মাথা ঘামাল রানা, সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্লজিটে ঢুকে পড়ল। পায়ের কাছে খালি একটা বালতি দেখতে পেয়ে কয়েকটা তোয়ালে ফেলে দিল ওর মধ্যে, তারওপর দরাজ হাতে ঢালল ফ্লোর ওয়াক্স। একটা মপের হাতল দিয়ে

নেড়েচেড়ে সবগুলো তোয়ালে ভাল করে ভিজিয়ে নিল। এবার একটা ম্যাচের কাঠি জ্বেলে ওগুলোর ওপর ছেড়ে দিল রানা, বেরিয়ে এল ক্লজিটের দরজা খোলা রেখে। অ্যালির শেষ মাথায় এসে সময় হওয়ার অপেক্ষায় থাকল ট্রেজো হাতে নিয়ে।

প্রথমে কিছুক্ষণ শুধু ধোঁয়া উড়ল, তারপর দপ্ করে জ্বলে উঠল তরল ওয়াক্স। ওগুলো পুড়ে শেষ হতে তোয়ালেতে ধরল আগুন, দাউ দাউ করে মাথাচাড়া দিল। ততক্ষণে কটু-গন্ধি ধোঁয়া কিচেনে পৌঁছে গেছে।

'ফুয়েগো!' একটা নারীকণ্ঠের চিৎকার শুনতে পেল ও। 'ফুয়েগো! ফুয়েগো!'

একটু পর বুট পরা দুজোড়া পায়ের ভারী আওয়াজ উঠল। গার্ড! 'আই, ফুয়েগো!' তাদের একজন চিৎকার করে উঠল, পরমুহূর্তে দড়াম করে দরজা খুলে বেরিয়ে এল লোক দুটো। ধোঁয়ার কারণে ঠিকমত চেহারা দেখা যাচ্ছে না কারও। কয়েক সেকেন্ড পর তৃতীয় জনের ওপর চোখ পড়ল রানার। ভীষণ মোটা এক মহিলা। সমানে হাত-পা ছুঁড়ছে আর বাঁশির মত তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচাচ্ছে। 'আগুন! আগুন!' করে।

সময় বুঝে এগোল রানা। হুঙ্কার ছাড়ল, 'হ্যান্ডস আপ্!'

বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে তাকাল গার্ড দু'জন, নাকের কয়েক ফুট সামনে উদ্যত ট্রেজো দেখে হাঁ হয়ে গেল। কিন্তু হাত তোলার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তাদের মধ্যে। উল্টে একজন সামলে নিয়ে ওয়েস্ট হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। অন্যজন নির্বোধের মত ঝাঁপ দিল ওকে লক্ষ্য করে।

ঠাণ্ডা মাথায় এক সেকেন্ডের মধ্যে দুটো গুলি করল রানা। যে পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল, তার ডান কনুই গুঁড়ো করে দিল ওর প্রথম বুলেট। তবে গুলি ফোটার আওয়াজ বা লোকটার আর্তচিৎকার, কোনটাই শুনতে পেল না রানা, দুটোই চাপা পড়ে গেল মহিলার তীক্ষ্ণ চিৎকারের তলায়। দ্বিতীয় গুলিটা লাগল শূন্যে

ভাসমান অন্য গার্ডের ডান কাঁধে। উড়ে এসে ওর পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল লোকটা, ওই অবস্থাতেও থাবা চালাল পা ধরার জন্যে।

চট্ করে এক পা পিছিয়ে এল রানা, জুতোর ডগা দিয়ে ধাঁই করে কষে এক লাথি ঝেড়ে দিল ওর চোয়ালে। ভীষণভাবে ঝাঁকি খেল মাথাটা, অনড় হয়ে গেল। এই অবস্থা দেখে আরও ভয় পেয়ে গেল মহিলা, গলার স্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে দিল।

ব্যাপারটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পিস্তল বাঁ হাতে নিল রানা, ডান হাতে মাঝারি ওজনের এক ঘুসি বসিয়ে দিল তার চোয়ালে। এবার লাইনে এল মহিলা, চোখ উল্টে ধড়াস্ করে আছড়ে পড়ল জ্ঞান হারিয়ে। 'এক্সকিউজ্য, সেনিয়রা,' মৃদু গলায় বলল রানা।

প্রথম গার্ড গুলিবিদ্ধ ডান কনুই চেপে ধরে গোঙাচ্ছে, আগে তাকে নিরস্ত্র করল। হোলস্টার থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে কোটের পকেটে ভরল। দ্বিতীয় গার্ডের পিস্তলটাও। পেদ্রোর ট্রেজো রাখল অন্য পকেটে। তারপর ফ্লোর মোছার একটা মপ তুলে নিল ও, ওটার কাঠের লম্বা হাতলের এক মাথা কোনমতে জ্বলন্ত বালতির হাতলের মধ্যে ভরে দিয়ে ক্লজিটের বাইরে নিয়ে এল ওটা।

সজ্ঞান গার্ডকে ক্লজিটে ঢোকাতে কোন সমস্যা হলো না, কিন্তু অন্য দুজনের বেলায় হলো। বলতে গেলে এক হাতে কাজ সারতে গিয়ে জিভ্ বেরিয়ে পড়ার দশা হলো ওর। কোনমতে কাজটা সেরে বাইরে থেকে ক্লজিট লক করে দিল রানা, তারপর এক হাতে লাঠির মাথায় জ্বলন্ত বালতি ও অন্যহাতে ওয়াক্সের ক্যান নিয়ে কিচেন হয়ে মীট লকারের উদ্দেশে ছুটল।

কিচেনের শেষ মাথায় ছোট একটা করিডর; তারপরই সেই রূম, যেটায় গার্ডদের তাস খেলতে দেখেছে ওরা। ভেতরে কেউ নেই এ মুহূর্তে, বাঁটা তাস উপুড় করে রাখা আছে টেবিলের দুই মাথায়। টেবিলের ওপাশে বড় এক লকার ডোর। ওটার

হাতলওয়ালা পীরিচ সাইজের ধাতব প্লাঞ্জারের নিচে ডান কাঁধ ভরে দিল রানা, ওপরদিকে চাপ দিয়ে খুলে ফেলল দরজা, এক লাথি মেরে পুরো মেলে দিয়েই দৌড়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। অসংখ্য হুক আর পাইপ বোঝাই পনেরো বাই বিশ ফুট হবে লকারটা।

ঢুকেই আঁতকে উঠল কয়েক হাত সামনে ম্যানেজারকে দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে। এ ব্যাটা কখন এল এদিকে? ভাবল ও, কোনদিক দিয়ে? প্রায় থেমেই পড়েছিল, সামলে নিয়ে লাফ দিল, লোকটাকে লক্ষ্য করে। ওদিকে, একটা অল ব্যান্ড ট্রান্সিভারের ওপর ঝুঁকে কিছু করছিল লোকটা, রানাকে এই মূর্তিতে দেখে সশব্দে আঁতকে উঠে শোল্ডার হোলস্টারের দিকে হাত চালিয়ে দিল। কিন্তু লাভ হলো না, তার আগেই মপ হ্যান্ডেলসহ পুড়ে লাল হয়ে ওঠা বালতি তার দিকে ছুঁড়ে দিল রানা।

ম্যানেজারের মুখের এক পাশে গিয়ে আছড়ে পড়ল বালতি, যন্ত্রণায় গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। লাফ মেরে সরে গেল আগুনের কাছ থেকে, এক হাতে গাল চেপে ধরে রেখেছে। চেহারা বিকৃত হয়ে আছে ভীষণভাবে। এই ফাঁকে দুই লম্বা লাফে তার কাছে পৌঁছে গেল রানা, ট্রেজোর বাঁট দিয়ে দড়াম করে মারল চোয়ালে।

চিৎকার থেমে গেল, ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে মেঝেতে আছড়ে পড়ল লোকটার অজ্ঞান দেহ।

নিশ্চিন্ত হয়ে রিমোট ট্রান্সমিটারটার ওপর চোখ বুলাল রানা। খাড়া কফিনের মত এক সারি মেটাল কেসিঙের মধ্যে রয়েছে তার বিভিন্ন অংশ। প্রতিটা কেসিঙে আছে অজস্র ডায়াল, নব ও সুইচ। অন্যদিকে লকারের সিলিঙে রয়েছে ফিল্ড-ফোর্সড গ্রিড, আবরণবিহীন মোটা তারের বেশ কয়েকটা কয়েল। একটার সাথে আরেকটা সংযুক্ত। দানবীয় আকৃতির বক্স-স্প্রিঙের মত দেখতে।

কয়েকটা মোটা কেব্‌লও আছে, এয়ার ডাক্টের বড় এক ফুটো

দিয়ে বেরিয়ে গেছে। জেনারেটর মৃদু গুঞ্জন তুলছে। খুব সম্ভব বেজমেন্টে আছে ওটা, রানা ভাবল, ফার্নেসের সাথে।

আকারে যেটা বড়, মাস্টার সুইচ ভেবে সেটা অফ করে দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন থেমে গেল। কয়েকটা ডায়ালের কাঁটা কেঁপে উঠে শুয়ে পড়ল। ওটা সেরে অজ্ঞান ম্যানেজারের কাছেই পড়ে থাকা তার পিস্তলটা তুলে নিল ও, বাঁট দিয়ে পিটিয়ে ভাঙতে শুরু করল ডায়াল, নব ও সুইচ। যা যা ভাঙা যায়, তার কোনটাই বাদ দিল না, একটা একটা করে সব গুঁড়ো করে দিল।

কাজটা সেরে কলার ধরে অজ্ঞান ম্যানেজারকে লকারের বাইরে এনে শুইয়ে রাখল রানা, তারপর ফিরে এসে প্রতিটা কেবিনেটে ওয়াক্স ঢালল কিছু কিছু করে। আগুন উস্কে দেয়ার জন্যে অবশিষ্টটুকু বালতির মধ্যে ঢেলে দিল। সবশেষে মপ হ্যান্ডেল দিয়ে একটা একটা করে জ্বলন্ত তোয়ালে তুলে নিয়ে ক্যাবিনেটগুলোর সামনে গড়িয়ে নেমে আসা ওয়াক্সের খুদে পুকুরের মধ্যে ফেলে দিল। গোটা লকার জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। ডাক্ট দিয়ে আসা বাতাসে ক্রমে বেড়ে চলল আগুনের তেজ।

দৌড়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রানা, এবং সঙ্গে সঙ্গে সোলার প্লেক্সাসে ভয়ঙ্কর এক ঘুসি খেয়ে কুঁকড়ে গেল। চোখমুখ বিকৃত করে সামনে তাকাল ও, দেখতে পেল 'ম্যানেজার' দাঁড়িয়ে আছে সামনে, চেহারায় হত্যার উন্মাদনা।

ব্যাপার টের পেয়ে মনে মনে শিউরে উঠল রানা। বেরিয়ে আসতে আর এক মুহূর্ত দেরি হলে চরম সর্বনাশ ঘটে যেত, ওকে ভেতরে রেখেই দরজা লাগিয়ে দিত লোকটা। আগুনে জ্যান্ত ভাজা হয়ে যেত রানা। কিন্তু ওর সৌভাগ্য যে সে সুযোগ পায়নি লোকটা। পিঠে আগুনের ছ্যাঁকা লাগতে সামনে ঝাঁপ দিল ও।

জবাবে গরিলার মত চার্জ করল লোকটা। স্প্যানিশে অকথ্য গালাগালি করতে করতে ওর নাকমুখ সই করে প্রচণ্ড এক ঘুসি ছুঁড়ল। ঝট্ করে এক পাশে সরে আঘাতটা এড়াল রানা, ভারসাম্য হারিয়ে এক পা এগিয়ে এল ম্যানেজার, আরেকটু এগোতে সাহায্য করল রানা। ডান হাতে লোকটা শার্টের কলার মুঠো করে ধরে ঝপ্ করে বসে পড়ল, পরক্ষণে শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। টান খেয়ে ওর দিকে ঝুঁকে এল লোকটা।

ব্যাপার টের পেয়ে দু'চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে তার, দু'হাতে কলার ছাড়াবার জন্যে প্রচণ্ড টানা হ্যাঁচড়া শুরু করে দিল। কিন্তু বড় দেরিতে। শুয়ে পড়েই দু'পা ভাঁজ করে তুলে ফেলেছিল রানা, ম্যানেজার ঝুঁকে আসতে ও দুটো তার তলপেটে বাধিয়ে জোরে ছুঁড়ল ওপরদিকে। ওর মাথার ওপর দিয়ে শূন্যে একটা ডিগবাজি খেল লোকটা, সেটা পুরো হওয়ার সামান্য আগে তার কলার ছেড়ে দিল রানা।

প্রলম্বিত একটা চিৎকার ছেড়ে লকারের মাঝখানে গিয়ে আছড়ে পড়ল লোকটা। মুহূর্তে জ্যান্ত মশালে পরিণত হলো। হাঁচড়েপাঁচড়ে দু'বার উঠে পড়ল সে, পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল নরককুণ্ড থেকে, কিন্তু হলো না। দু'বারই তরল ওয়াক্সে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। মাংস পোড়ার বিকট গন্ধ নাকে ঝাপ্টা মারতে লকারের দরজা বন্ধ করে দিল রানা। ওটায় পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

সবার অলক্ষে ককটেল লাউঞ্জে ফিরে এল রানা। দূর থেকে ওকে দেখতে পেয়ে সোহানার টান্ টান্ পেশীতে ঢিল পড়ল, পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও।

'ওফ্, খোদা!' রানা এসে বসতে বলল। 'আমি তো ভেবেছিলাম...'

'আর ফিরব না আমি। তাই তো?' হাসিমুখে সিগারেট ধরাল রানা। 'এবার তো ভুলটা ভেঙেছে?'

কটমট করে তাকাল সোহানা, কিন্তু রানার খেয়াল নেই

সেদিকে। ও তখন কারমেন লাবাম্বার নাচ দেখায় মগ্ন। চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে শো, দেহের নিচের অংশে তেকোনা প্যান্টি, আর ওপরে নামকাওয়াস্তে ব্রা ছাড়া কিছু নেই মেয়েটির পরনে। ঘামে চক্‌চক্ করছে সারা দেহ।

'নাচ শেষ হওয়ার আগেই কেটে পড়তে হবে,' বলল রানা। 'এখানকার কাজ শেষ।'

'তাই? তাহলে এখনই উঠে পড়া ভাল।'

উঠে পড়ল ওরা। শূন্য চেক-আউট কাউন্টারের ওপর দিয়ে ঝুঁকে ভেতরে তাকাল রানা। যা ভেবেছিল তাই, ওখানে সত্যিই একটা ওয়াকি-টকি আছে। ম্যানেজারের গলা নকল করে ওটার সাহায্যে বাইরের গার্ডের সাথে ধমকের সুরে কথা বলল ও। জানিয়ে দিল, পাইলট দু'জন চলে যাচ্ছে, তাদের যেন বাধা দেয়া না হয়।

বাধা দিল না ওরা, বরং হাসিমুখে টা-টা করল ওদেরকে।

আবহাওয়া তখন আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে।

তেরো

অ্যারোনটিক্যাল ম্যাপ অনুযায়ী পুন্টারেনাস থেকে চারশো মাইল দূরে আইলা ডি সাংরি, কিন্তু এই অবস্থায় সরাসরি সেদিকে যাওয়ার চেষ্টা হবে আত্মহত্যার নামান্তর। সোহানা তা বোঝে, তাই আকাশে উঠে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর বিশাল এক বৃত্ত রচনা করে এগোল। কম করেও পঞ্চাশ মাইল হবে সেটার ব্যাস,

একশোও হতে পারে। এরপর উচ্চতা বাড়িয়ে-কমিয়ে, এঁকেবেঁকে চলতে লাগল।

গালফ অভ চিরিকি পেরিয়ে এল ওরা। এখানকার সবচেয়ে বড় দ্বীপের নাম কোইবা-পেনাল কলোনি ওটা। দেশের গুরুতর অপরাধীদের নির্বাসন দেয়া হয় এখানে। এরপর আযুয়ারো পেনিনসুলাকে পাশ কাটিয়ে এসে পড়ল একশো বিশ মাইল প্রশস্ত গালফ অভ পানামার ওপর। ওটার মাথায় রয়েছে বে অভ পানামা, পানামা সিটি ও বালবোয়া।

পুরোটা সময় ঝাঁকির পর ঝাঁকি খেল ওদের সেসনা। এছাড়া হঠাৎ অদৃশ্য হাতের থাবড়া খেয়ে কাত হয়ে পড়া, ঘুড়ির মত গোঁত্তা খাওয়া, এয়ার পকেটে ঝাঁপিয়ে পড়া বা হঠাৎ হঠাৎ বেদিশার মত নাক উঁচু করে ছোটা, ইত্যাদি তো ছিলই। ভেতরে রানা ও সোহানা স্থির হয়ে বসতে পারেনি এক মুহূর্তের জন্যেও। লাফ-ঝাঁপ, সামনে-পিছনে বা ডানে-বাঁয়ে দোল, এসবের সাথে একটু পরপরই লড়তে হয়েছে ওদের। সীটের নরম স্পর্শ যেটুকু পেয়েছে, তারচেয়ে বহুগুণ বেশি সময় থাকতে হয়েছে শূন্যে—লাফালাফির ওপর।

খুদে সেসনার ফিউযিলাজ গুঙিয়েছে সারাক্ষণ, ককিয়েছে। একেক সময় মনে হয়েছে এই বুঝি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এক এয়ার পকেটে পড়ার সময় আহত কাঁধে আঘাত পেয়েছে রানা, নতুন করে রক্ত ঝরতে শুরু করায় আবার সোহানাকে ব্যান্ডেজ করে দিতে হয়েছে ওখানটায়। কিন্তু ব্যথা রয়ে গেছে, এখনও মাথা ঝিমঝিম করছে রানার। ক্ষত টন্‌টন্ করছে। নতুন ব্যান্ডেজ চুঁইয়ে রক্তও পড়ছে একটু একটু।

'কোথায় যেতে হবে, রানা?' সোহানা প্রশ্ন করল এক সময়।

'পানামা সিটি,' প্লেনের ও বাতাসের হুঙ্কার ছাপিয়ে চেঁচিয়ে বলল ও।

'কেন? আইলা ডি সাংরি তো আর্কিপেলাগো ডি লা পের্লাসের

অংশ। জায়গাটা এখান থেকে পুবে, উত্তরে নয়।'

মাথা দোলাল ও। আর্কিপেলাগো শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সী অভ মেনি আইল্যান্ডস'। এই আর্কিপেলাগোর দ্বীপের সংখ্যা একশো আশি। একেকটা খুদে পার্ল বা মুক্তো—এ জন্যেই এটার নাম ডি লা পের্লাস। উপসাগরের অন্য প্রান্তে ওগুলো।

হাঁটুর ওপরকার খোলা ম্যাপে খোঁচা মারল রানা। 'এই জঘন্য ওয়েদারে প্লেনের প্রপেলারই তো দেখতে পাচ্ছি না আমি, এতগুলো দ্বীপের মধ্যে থেকে ওটাকে সনাক্ত করব কি করে? এই জন্যেই পানামা সিটি যেতে চাইছি। ওখান থেকে দ্বীপটা মাত্র চল্লিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। বিয়ারিং পেতে সুবিধে হবে আমাদের।'

টেগুসিগালপা ও পুন্টারেনাস দেখে মনে হয়েছিল ও দুটোই বুঝি কবীর চৌধুরীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আক্রোশের শিকার হয়েছে, কিন্তু পানামা সিটির ওপর এক পলক নজর বোলাতে সে ভুল ভাঙল রানার। স্রেফ ধ্বংস আর মৃত্যুর জ্বলন্ত এক দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শহরটা—কবীর চৌধুরীর বিজয়স্তম্ভ হয়ে। দালানকোঠায় বাড়ি খেয়ে গোঁ-গোঁ শব্দে বোবা কান্না কাঁদছে বাতাস। এলোপাতাড়ি ছোটাছুটি করছে, প্রাণের স্পন্দন কোথাও আছে কি না, শুকনো পাতা, কাগজ উড়িয়ে হন্যে হয়ে খুঁজছে।

নেই।

প্রায় সাত লাখ মানুষের বাস পানামা সিটিতে। এখন সেটা জনশূন্য। গোটা শহর ভেঙেচুরে, দুমড়ে-মুচড়ে, তালগোল পাকিয়ে এক অবিশ্বাস্য রূপ নিয়েছে। পাঁচ মাইল দূরের আদি পানামা সিটির গতকাল যে অবস্থা ছিল, আজ নতুন পানামা সিটিরও সেই অবস্থা। বরং তার চেয়েও বহুগুণ খারাপ অবস্থা। ১৬৭১ সালে হেনরি মর্গান দ্য বাক্যানিয়ারের ভয়াবহ আক্রোশের শিকার হয়েছিল আগেরটা, আর এটা ১৯৯—সালে কবীর চৌধুরীর…

ওর অন্যতম প্রিয় শহরের এই দুর্দশা দেখে মাথা নেড়ে নীরব বেদনা প্রকাশ করল মাসুদ রানা। অনেক স্মৃতি ভিড় করল মনের পর্দায়—দর্শনীয় অ্যানকন হিল, শহরের ঘুম ভাঙানি প্রকাণ্ড ঘণ্টাওয়ালা অ্যাভেনিডা সেন্ট্রাল ক্যাথিড্রাল, ওল্ড গভর্নমেন্ট প্যালেস, ন্যাশনাল থিয়েটার, সব এমনভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে যে কোনটা কি, কোথায় ছিল, বুঝে উঠতে পারল না ও। বিয়ারিং নিল সোহানা।

বালবোয়ার ক্যানাল জোন পোর্টেরও একই অবস্থা। ওপর থেকে মিরাফ্লোরেস লকস্ আবছামত দেখতে পেল রানা। দুটো চ্যানেল ওটার, দুটোই জমে নিরেট বরফের মাঠ হয়ে আছে। ওর মনে হলো বিশ্বের সর্ববৃহৎ আইস স্কেটিং রিঙ্ক ও দুটো। কয়েকটা ফ্রেইটার ও ট্যাঙ্কার আটকা পড়ে আছে ওর মধ্যে—পাঁচশো ফুট চওড়া ও পঁয়ত্রিশ ফুট গভীর বরফের ফাঁদে। হাড় জমানো প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা আঘাতে আঘাতে মসৃণ করে তুলছে তার সারফেস। ইসথুমস সিটির অন্য প্রান্তের অবস্থা হয়েছে এটার।

বুকের ভেতর অসহ্য রাগ ফেনিয়ে উঠছে রানার, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের উর্বর, প্রাণচঞ্চল এক অঞ্চলের বর্তমান করুণ দশা দেখে পুরানো শপথটা মনে মনে আরও কয়েকবার উচ্চারণ করল।

'চলো!' ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলল ও। ভেতরে ভেতরে অসুস্থ লাগছে নিজেকে। 'দক্ষিণ-পশ্চিমে চলো।'

ধমক খেয়ে ভুরু কুঁচকে উঠেছিল সোহানার, কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভুলে গেল ব্যাপারটা। নীরবে প্লেন ঘুরিয়ে দিল আইলা ডি সাংরির দিকে।

'কবীর চৌধুরীকে ওখানে পাওয়া যাবে মনে হয় তোমার?'

'আশা করছি যাবে,' ব্যগ্র কণ্ঠে বলল ও। শেষবারের মত তাকাল নিচের দ্রুত অপসৃয়মান সাদা ল্যান্ডস্কেপের দিকে। দাঁতে দাঁত চাপল। 'যদি পাই, দ্বীপটা কবীর চৌধুরীর রক্তে লাল করে

ছাড়ব।'

সান মিগুয়েল, সান হোসে বা পেদ্রো গনযালেযের মত একটু বড় আকারের দ্বীপ সহজেই সনাক্ত করতে পারল ওরা, কিন্তু আসলটার ব্যাপারে কাজটা হলো উল্টো। কারণ ম্যাপে যেমন পিনের মাথা আকৃতির দেখানো হয়েছে, বাস্তবেও দ্বীপটা প্রায় সেরকমই। পানি থেকে মাথা জাগিয়ে থাকা কিছু পাথরের সমষ্টি। তারওপর সমানে তুষার ও শিলা বৃষ্টি চলছে বলে সনাক্ত করতে সময় লাগল। একই মুহূর্তে দেখল ওরা, ফেনিল সাগর থেকে থেকে ভেঙে পড়ছে দ্বীপটার সৈকতে।

ক্রস-কারেন্টের মুখে পড়ে বেহাল দশা হলো খুদে সেসনার, ওটাকে বাগে আনতে হিমশিম খেতে লাগল সোহানা। এদিকে রানা ল্যান্ড করার মত উপযুক্ত একটা জায়গার খোঁজে ব্যস্ত।

'মনে হচ্ছে বীচেই ল্যান্ড করতে হবে,' বলল ও। 'ওপরে কোথাও একটা পাখিও এখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।'

'বাঁ দিকে ওটা কি?' সোহানা বলল। ওর সুবিধের জন্যে একশো আশি ডিগ্রী ঘোরাল প্লেন।

তুষার ও শিলা বৃষ্টির গাঢ় পর্দার ভেতর দিয়ে এক জায়গায় কিছু আলো দেখতে পেল রানা। কয়েকটা বিল্ডিং আছে ওখানটায় প্রাচীন বসতবাড়ির মত, চারদিকে প্রচুর খালি জমি। বাড়িগুলোকে ঘিরে রেখেছে একফুট চওড়া পাথরের দেয়াল। লোহার রিইনফোর্সড় বারওয়ালা কয়েকটা ভারী কাঠের দরজা আছে দেয়ালে।

'হ্যাসিয়েনডা বলে ওগুলোকে,' রানা বলল। 'ওরই মধ্যে আছে কবীর চৌধুরী।' সোহানার বাহু আঁকড়ে ধরল শক্ত মুঠোয়। 'ওই দেখো ওর কপ্টার, আঙিনায় বাঁধা!'

'দেখেছি,' চেহারা বিকৃত করে বলল সোহানা। 'কিন্তু দয়া করে হাতটা ছাড়ো। নইলে এখনই ক্র্যাশ করব আমরা।'

চট্‌ করে মুঠোয় ঢিল দিল ও। 'সরি!' হাত সরিয়ে নিল। অবশেষে উন্মাদটার খোঁজ পাওয়া গেছে দেখে হাসছে নিঃশব্দে। ব্যস্ত হয়ে ল্যান্ড করার জায়গা খুঁজছে। ওই হ্যাসিয়েনডার মালিক ছিল এক লেস-ফিতে বিক্রেতা, টনিচি কারপো, হন্ডুরান ট্যুরিস্ট গাইডে তথ্যটা পড়েছে রানা।

একটা গোল টিলার ওপর ওটা। দেয়ালের মেইন গেট থেকে একটা রাস্তা প্রায় খাড়া টিলা বেয়ে নিচে নেমে গেছে। ওটার শেষ মাথায় একটা ট্রেইল, বড় বড় বোল্ডারের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির তৈরি এক গুহার দিকে চলে গেছে। গুহাটা বোটহাউস। কারপোর ইয়ট থাকত ওখানে। টিলার ওপরদিকটা মোটামুটি মসৃণ হলেও চারদিকে প্রচুর রিজ, গিরিসঙ্কট ও ঘন বনজঙ্গল আছে।

'বীচ ছাড়া ল্যান্ড করার মত জায়গা দেখছি না,' রানা বলল। 'যেদিক থেকে এসেছি, সেদিকে একটা জায়গা দেখেছিলাম। মনে হয় নামা যাবে ওখানটায়।'

নীরবে মাথা দুলিয়ে সেসনা ঘোরাল সোহানা। উত্তেজনা আর পরিশ্রমে ঠোঁট সাদা। রানার নির্দেশিত জায়গায় ল্যান্ড করার প্রস্তুতি নিল ও। রানা বুঝল কাজটা সহজ হবে না। প্রচণ্ড বাতাস ঠেলে-গুঁতিয়ে প্লেনটাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে জায়গা থেকে। কিন্তু সোহানা অটল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'এ জায়গাও তো বাড়িটা থেকে যথেষ্ট দূরে।'

'হোক না। হেঁটে পৌঁছব, যদি তুমি আস্ত ল্যান্ড করাতে পারো এটাকে,' সীটের হাতলে দুটো চাপড় লাগাল ও।

কাজটা নিজের মর্জি অনুযায়ী করতে চাইল সোহানা, কিন্তু প্রচণ্ড বাতাস সব গুবলেট করে দিল। শেষ মুহূর্তে যেন সিঙ্কহোলের টানের মুখে পড়েছে, এমনভাবে ঝাঁপ দিল খুদে প্লেন। ক্রমাগত ঝাঁকি আর দোল খেতে খেতে নিচের দিকে ছুটল। উড়ন্ত বালির পর্দার ওপাশের দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠল রানা—সারি সারি সুঁচলো মাথার পাথুরে পিলার ছুটে আসছে ওদের দিকে।

'ফ্লেয়ার আউট! ফ্লেয়ার আউট!' সেসনার মাথা বেশি নিচু হয়ে গেছে দেখে চেঁচিয়ে উঠল ও, যদিও জানে ওটাকে সোজা করার সাধ্যমত চেষ্টা করছে সোহানা, কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না।

একেবারে আচমকা দেখা দিল বীচ, সাঁ-সাঁ করে উঠে আসছে, তারপরই প্রচণ্ড এক আছাড়। বজ্রপাতের মত বিকট শব্দে দুমড়ে মুচড়ে গেল সেসনার ফিউযিলাজ। পরক্ষণে বাউন্স করল ওটা, খানিকটা উড়ে গিয়ে ফের আছড়ে পড়ল। গতি না থামা পর্যন্ত কম করেও দশবার ড্রপ খেল সেসনা, তারপর স্থির হলো। ততক্ষণে গায়েব হয়ে গেছে দুই উইং, প্রপেলার ভাঁজ হয়ে হাব-এ সেঁধিয়ে গেছে।

এদিকে ভেতরে আছাড় খেতে খেতে ওদের দু'জনের অবস্থাও কাহিল। এখানে সেখানে কেটে ছিঁড়ে বিচ্ছিরি অবস্থা। তাও ভাল যে অনেক নিচে থাকতে ব্যাপারটা ঘটেছে, বেশি ওপর থেকে পড়লে আর দেখতে হত না।

অনেকক্ষণ পর ঘোর কাটতে হাত-পা নেড়েচেড়ে দেখল ওরা–ঠিকই আছে, হাড়গোড় ভাঙেনি। 'কমার্শিয়াল ফ্লাইটের এই ধরনের ল্যান্ডিংই আমার পছন্দ,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল রানা।

সোহানা রেগে উঠলেও কিছু বলল না। অসহায় চোখে দোমড়ানো-মোচড়ানো প্লেনটার দিকে তাকিয়ে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'কি হবে এখন? প্লেন তো শেষ। আর কোন কাজে আসবে না।'

রানা কিছু বলল না। ভাবছে।

চোদ্দ

'কিছু বলছ না যে!' চোখ কুঁচকে ঘুরে তাকাল সোহানা। সামনে চলে আসা এক গোছা চুল কানের পিছনে গুঁজল।

'কি?' রানা বলল।

'এবার কি?'

হাত বাড়িয়ে পিছন থেকে বাস্কেটটা সামনে নিয়ে এল ও। ওটার মধ্যে আছে সোহানার স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন, ডক্টর ফার্নান্দেজের ম্যাকারভ পিএম, পেদ্রোর পয়েন্ট টুটু অটোম্যাটিক এবং দুই গার্ড ও হোটেল ম্যানেজারের তিন রিভলভার। সোহানারটা ওর হাতে দিয়ে অন্যগুলো নিজের পকেটে ভরল রানা।

'এবার কি?' বলল ও। 'কেন, সৈকত দর্শন!'

ভীষণ দুর্গম পিচ্ছিল পথ ধরে এগোল ওরা হাত ধরাধরি করে। মাথার ওপর একটু পরপর বিকট গর্জন করছে আকাশ, বিদ্যুৎ ঝিলিক মারছে। চারদিক প্রায় অন্ধকার। কিছু দীর্ঘ, সরু গাছ অসহায়ের মত মাথা নাড়ছে, গোঙাচ্ছে শিল ও বাতাসের উপর্যুপরি হামলায়। ছোট ছোট পাথর স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়ছে গিরিখাতে।

প্রচণ্ড দমকা বাতাস একেক সময় রানা-সোহানার ফুসফুসের সমস্ত বাতাস শুষে নিয়ে যাচ্ছে, দম নেয়ার জন্যে ডুবন্ত মানুষের মত খাবি খাচ্ছে ওরা। রানার মনে হলো ওদেরকে খোলা জায়গায়

পেয়েই হয়তো মানুষের সৃষ্ট ঝড়টা তার আসল রুদ্র চেহারা ধারণ করেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে আরও বেশি ভয়ঙ্কর, আরও অশান্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

শিলার আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে সোহানার অনিন্দ্যসুন্দর, ফরসা মুখটা। নিজের অবস্থা ওকে দেখেই বুঝতে পারছে রানা। কাঁধের ব্যথাটা খুব ভোগাচ্ছে। কিন্তু ওটার কথা ভুলে থাকার জন্যে অন্যদিকে মন ব্যস্ত রাখল। ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট আঙুল দিয়ে একে অন্যকে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা।

আধঘণ্টা পেরিয়ে গেল, আরও পনেরো মিনিট কাটল, তারপর আরও আধ ঘণ্টা। অবশেষে টিলার গোড়ায় পৌঁছল ওরা। একশো গজ ওপরের পুরু দেয়ালটার দিকে তাকাতে মেইন গেট চোখে পড়ল। ঘন তুষার ও শিলাবৃষ্টির মধ্যে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে ওটাকে। ওখানে গার্ড আছে কি না খুঁজতে লাগল রানা। চোখে পড়ল না। কিন্তু ও জানে নিশ্চয়ই আছে। বাইরের দিকে নেই, এই আবহাওয়ায় থাকার কথাও নয়। আছে ভেতরে কোথাও, দেয়ালের আড়ালে।

'গেট দিয়ে ঢোকা যাবে না,' বলল রানা। 'ভেতরে নিশ্চয়ই গার্ড আছে। ঢুকতে হবে দেয়াল টপকে।'

'কম করেও পনেরো ফুট উঁচু হবে দেয়াল,' সোহানা মাথা নাড়ল। 'কি করে সম্ভব টপকানো?'

'যে করে হোক টপকাতেই হবে। ব্যর্থ হলে নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু আমি ব্যর্থ হতে চাই না।'

ওর বলার ধরন দেখে হেসে ফেলল সোহানা। বলল, 'আমিও মরতে চাই না।'

'ঠিক বলেছ,' মাথা ঝাঁকাল ও। 'এই বয়সে মরতে চাওয়া কোন কাজের কথাও নয়। এসো,' বলে পা বাড়াল।

হ্যাসিয়েনডার মেইন গেটের উল্টোদিক থেকে উঠতে শুরু করল ওরা। বেশ কঠিন হয়ে দেখা দিল কাজটা। কেননা এদিকটা বেশ খোলামেলা, পায়ের নিচের কঠিন বরফ প্রায় মসৃণ করে রেখেছে বাতাস। সামান্য বেখেয়াল হলেই পা পিছলে যায়।

হাজার সতর্ক থেকেও সুবিধে করতে পারল না ওরা, খানিক পরপর আছাড় খেয়েই চলেছে কেউ না কেউ। একবার দুজনেই পড়ল একসাথে, সরসর করে পিছলে নেমে গেল অনেকটা। পাথরের এক ফাটলে আঙুল ভরে দিয়ে অনেক কষ্টে পতন ঠেকাল রানা, ওর পা ধরে ঝুলতে থাকা সোহানাকে টেনে তুলল। কঠিন পরিশ্রম আর অসহ্য ঠাণ্ডায় একেক সময় হাল ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হলো রানার।

মন চাইছে শুয়ে পড়তে, তারপর যা হয় হোক, কেয়ার করে না ও। কিন্তু জীবন হার মানতে রাজি নয়, সে তার লড়াই লড়ে চলেছে।

দেয়ালের কাছে পৌঁছতে বাতাসের আক্রমণ কিছুটা কমল। জড়সড় হয়ে বসে থাকল ওরা দম ফিরে পাওয়ার অপেক্ষায়। ওর মধ্যেই দেয়ালটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল রানা। বেশ পুরনো ওটা। পনেরো নয়, বারো ফুট উঁচু। খুঁজে পেতে আঙুল ও জুতোর ডগা ঢোকানোর মত কিছু ফাঁক বের করল ও, তারপর সোহানার দিকে ফিরল।

'আমি ওপরে উঠে গেলে তুমি উঠবে।'

'যদি উঠতে পারো, তাই না?' বলল সোহানা।

দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ও। 'বলেছি, "আমি ওপরে উঠে গেলে তুমি উঠবে"। ওর মধ্যে "যদি" ছিল না। আর আমার সঙ্কেতের জন্যে অপেক্ষা কোরো। গার্ড থাকতে পারে ওপাশে।'

ভেজা, পিচ্ছিল দেয়াল ধরার সুবিধের জন্যে হাতের গ্লাভস খুলে পকেটে ভরল ও। ধীরেসুস্থে উঠতে শুরু করল। মাত্র বারো ফুট উঠতেই ঠাণ্ডায় আঙুলগুলো পুরো জমে যাওয়ার জোগাড় হলো। ওগুলো এত দ্রুত ক্ষমতা হারাতে লাগল যে রীতিমত ভয় ধরে গেল রানার। ভেতরের রক্ত চলাচল থেমে গেছে যেন, পেশী

লোহা হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে দেয়ালের গোড়ার কাছের একটা পাথর খসিয়ে ফেলল রানা, পরক্ষণে নিচ থেকে সোহানার ক্ষীণ চিৎকার শুনতে পেল। ভয় পেয়েছে। খানিকটা উঠে থেমে পড়ল ও, আর কুলোচ্ছে না শক্তিতে, মন হাল ছেড়ে দিতে পরামর্শ দিচ্ছে।

শুনল না রানা। কবীর চৌধুরী নাগালের মধ্যে রয়েছে, এই চিন্তাটা নতুন উদ্দীপনা জোগাল, গরম করে তুলল রক্ত। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে দেয়াল আঁকড়ে ধরে ঝুলে থাকল ও দৈত্যাকার গিরগিটির মত। ফাটল ও গর্ত খুঁজে বের করে উঠে যেতে লাগল ইঞ্চি ইঞ্চি করে। তারপর অনেক কষ্টে নিজেকে তুলে ফেলল ওপরে।

এক ফুটেরও বেশি চওড়া দেয়াল। ওপরে ঘন করে গাঁথা আছে তীক্ষ্ণধার কাঁচের টুকরো, কিন্তু জমাট বরফের তলায় চাপা পড়ে গেছে সেসব। সারফেস প্রায় সমান হয়ে আছে বলে কোন সমস্যা হলো না ওর। বরং পিচ্ছিল জায়গায় ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্যই করল ওগুলো।

সোহানাকে উঠে আসার জন্যে সঙ্কেত দিতে যাচ্ছিল ও, তখনই এক গার্ডের ওপর চোখ পড়ল। দেয়াল ও সবচেয়ে কাছের বিল্ডিংটার মধ্যে হাঁটাহাঁটি করছে দ্রুত পায়ে। মাথা নিচু করে দু'হাত ওভারকোটের পকেটে ভরে রেখেছে লোকটা। ডান কাঁধে ঝুলছে একটা অটোম্যাটিক রাইফেল। শুয়ে পড়ল রানা; মুখ ঘুরিয়ে উঠতে নিষেধ করতে যাচ্ছিল সোহানাকে।

কিন্তু আগেই উঠতে শুরু করে দিয়েছিল ও, এরমধ্যে অর্ধেক উচ্চতা পেরিয়েও এসেছে। এদিকে গার্ড দেয়ালের দিকেই আসছে এ মুহূর্তে। কোনরকম শব্দ হলে শুনে ফেলার আশঙ্কা আছে। দম বন্ধ করে শুয়ে থাকল রানা। যা ভয় করছিল, শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল।

দেয়ালের গর্ত থেকে সোহানার পা সরে গেল, পড়ে যাচ্ছে

ভেবে চেঁচিয়ে উঠল ও। তেমন জোর ছিল না তাতে, তবু শব্দটা ঠিকই কানে গেল ব্যাটার। ঝট্ করে মুখ তুলল সে, চোখাচোখি হয়ে গেল রানার সাথে। ঝাঁপ দিল ও। বিপদ টের পেতে কয়েকটা মূল্যবান সেকেন্ড নষ্ট করে ফেলেছে গার্ড, পরে অবশ্য ব্যস্ত হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। রাইফেলটা কাঁধ থেকে পুরোপুরি নামাতে পারার আগেই লোকটার ঘাড়ের ওপর পড়ল রানা।

দু'জনে মিলে হুড়মুড় করে পড়ে গেল নরম তুষারের বিছানায়। পড়েই এক লাফে তার বুকে চেপে বসল ও। রাইফেল ছুটে গেছে গার্ডের হাত থেকে। তৃপ্তির সাথে মারল তাকে রানা। নাকেমুখে ভয়ঙ্কর এক ঘুসি ঝেড়ে দিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ করে দিল লোকটাকে, এই সুযোগে পাশে পড়ে থাকা রাইফেলটা খাব্লা মেরে তুলে নিয়ে বাঁট দিয়ে দড়াম করে মারল তার চোয়ালে। হাড় ভাঙার জোরাল শব্দ উঠল, একটা অস্ফুট আওয়াজ ছেড়ে স্থির হয়ে গেল গার্ড।

'রানা!' ওপর থেকে মৃদু গলায় ডাকল সোহানা। মুখ তুলে ওকে দেয়ালের প্রান্তে বসা দেখল ও। 'দুঃখিত। ভুল হয়ে গেছে।'

'বলো অন্যায় হয়ে গেছে। আমার নির্দেশ ঠিকমত ফলো করোনি তুমি।'

'বললাম তো, দুঃখিত। ওপাশে একা থাকতে খুব ভয় করছিল।'

'নেভার মাইন্ড। জাম্প।'

চোদ্দ ফুট ওপর থেকে নিচে তাকিয়ে ঢোক গিলল সোহানা। ভয় লাগছে।

'ভয় নেই,' অভয় দিয়ে বলল ও। 'আমি ধরব তোমাকে। লাফ দাও।'

দু'পা যতদূর সম্ভব ঝুলিয়ে দিয়ে হাত ছেড়ে দিল সোহানা। রানা ধরে ফেলল ঠিকই, কাজটা এক হাতে করতে হয়েছে বলে

সুবিধে করতে পারল না, ভার সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে ওকে নিয়ে পড়ে গেল। পর মুহূর্তে সামলে নিয়ে উঠে পড়ল দু'জনে।

'এবার?' সোহানা প্রশ্ন করল।

'মেইন হাউসে ঢুঁ মারতে হবে। চৌধুরীর শেষ ফিল্ড-ফোর্স ট্রান্সমিটার ওখানেই আছে সম্ভবত। স্রষ্টা আর সৃষ্টি, দুটোকেই শেষ করতে হবে।'

'কিন্তু ওই পর্যন্ত পৌঁছার আগে এরকম কতজনকে মোকাবিলা করতে হবে কে জানে?' অজ্ঞান গার্ডকে দেখাল ও।

'চলো। জেনে নেয়া যাক।'

গার্ডের র‍্যাপিড রাইফেলটা সঙ্গে নেয়ার ইচ্ছে ছিল রানার, কিন্তু লোকটার অবহেলার কারণে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মেকানিজম জমে গেছে দেখে ওটা ফেলে একটা রিভলভার বের করল পকেট থেকে। সোহানাকে পাশে নিয়ে সামনে এগোল। ওর হাতে রয়েছে নিজের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন। হ্যাসিয়েনডার এক কোনায় পৌঁছে ইনার কোর্টইয়ার্ডের দিকে তাকাল রানা। কপ্টারটা ওখানেই পার্ক করা আছে। কাছেপিঠে কেউ নেই ওটার।

যান্ত্রিক ফড়িংটার কাছেই মেইন ভবন—লম্বা, সরু। কবীর চৌধুরী ওটার মধ্যেই আছে সন্দেহ হলো রানার। ভেতরের অন্যসব ভবন থেকে ওটা বড়। এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত ছাতওয়ালা পোর্চ। মাঝামাঝি জায়গায় উঁচু খিলান, তার নিচ দিয়ে ভেতরের কার পার্কে যাওয়ার চওড়া রাস্তা। পার্কের শেষ মাথায় ভবনের মেইন গেট। এ মুহূর্তে প্রবল তুষারপাতের ফলে পোর্চ প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। রানার দৃঢ় বিশ্বাস, ওখানে আরও অন্তত একজন গার্ড অবশ্যই আছে।

'ঘুরপথে এগোতে হবে,' বলল ও। দু'জনে মিলে ঝুঁকে এগোল পাশের বাড়িটার দিকে। হ্যাসিয়েনডার এদিকে গ্যারেজের মত আরেকটা ঘর আছে, ওটার কাছ ঘেঁষে এগোতে লাগল। শেষ

মাথায় পৌঁছে থামল রানা। ওদের ডানদিকে দশগজ মত একটা ইয়ার্ড, তার ওপাশে আসল বাড়ির প্রান্ত।

অনেকক্ষণ কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, কোন আওয়াজ নেই। নিশ্চিত হয়ে একদৌড়ে ওটার পিছনে চলে এল। সামনেই দেখা গেল একসার রট আয়রনের বারওয়ালা জানালা—সবগুলো অন্ধকার। দুটো দরজাও আছে। একটুপর খিলান চোখে পড়ল, সেই সাথে আরও কয়েকটা জানালা। কয়েকটায় আলো জ্বলছে। মূল ভবনের প্রধান ফটক যেমন বড়, তেমনি ভারী। ওটার কাছে ফোন বুদের মত একটা কিউবিকল্ আছে। গার্ড হাট। ড্রাইভেও আলো জ্বলছে দেখে মাথা নাড়ল রানা।

'ড্রাইভে গার্ড আছে,' বলল ও। 'কি ভাবে পার হওয়া যায়?'

'মেয়ে দেখলে হয়তো গুলি করবে না ওরা,' সোহানা বলল।

'কি?'

'বলছি, মেয়ে দেখলে হয়তো গুলি ছোঁড়ার আগে...'

'ভুলে যাও। আগে গুলিই ছুঁড়বে ওরা। প্রশ্ন করবে পরে।'

ওকে অনুসরণ করতে বলে ঝুঁকে পা বাড়াল রানা। একটা দরজা পেরিয়ে এসে একটা আলোকিত জানালা অতিক্রম করল। উঁকি দিয়ে দেখে নিল ভেতরে কেউ নেই। ওর দেড় ফুট পিছনে রয়েছে সোহানা। দ্বিতীয় দরজা অতিক্রম করে আরেকটা আলোকিত জানালার কাছে চলে এল রানা। থমকে দাঁড়াল মানুষের গলা শুনে। একটু উঁচু হয়ে সাবধানে উঁকি দিল। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড।

প্রথমেই চোখ পড়ল কবীর চৌধুরীর ওপর। হাত পিছনে বেঁধে পায়চারি করছে। মাথার এক অংশে ব্যান্ডেজ। তার বাইরের ঝাঁকড়া, কাঁচাপাকা চুলগুলো বড় বেশি এলোমেলো। চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। ক্ষিপ্ত চাউনি। মুখ নড়ছে অনবরত, কিন্তু কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না। ঘরের মাঝখানে বড় একটা টেবিল, আসা-যাওয়ার পথে প্রতিবারই ওটার ওপর ঘুসি মারছে।

ইলেকট্রনিক পার্টস, বিশেষ করে অসংখ্য ট্রানজিস্টর, সার্কিট বোর্ড, সোল্ডারিং আয়রন এবং নীড্‌ল প্লায়ার্সে বোঝাই টেবিলটা।

চৌধুরীর পিছনে কয়েকটা মেটাল কেবিনেট ও কন্ট্রোল বোর্ড। এরকমই কয়েকটা ধ্বংস করেছে রানা হোটেল ভ্যাকেশনে। অবশ্য এগুলোর গ্রিড খোলা, উন্মুক্ত। নানা রঙের সরু সরু তার ঝুলছে সর্বত্র। এখানে কবীর চৌধুরী কি করছে বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। নতুন মাস্টার কন্ট্রোল তৈরি করছে বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা সফল করার জন্যে। ওগুলো ইঙ্গিত করে সোহানাকে কিছু বলল ও নিচু কণ্ঠে। মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

আবার ভেতরে নজর দিল রানা। লোকটা কার সাথে কথা বলছে বুঝতে পারল না। একটু সরে এসে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল ও, এবার দেখতে পেল তাকে। সরু মুখের টোচেল। কবীর চৌধুরীর ডান হাত। এ মুহূর্তে আগের চেয়েও শীতল, আগের চেয়েও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে লোকটাকে। এক রোল কাগজ দেখা গেল তার হাতে। দুর্বোধ্য সব ডায়াগ্রাম আঁকা।

ওগুলো টেবিলের ওপর মেলে ধরল টোচেল, কাছে এসে চোখ বোলাতে লাগল চৌধুরী। আঙুল দিয়ে ডায়াগ্রামের এখানে-সেখানে খোঁচা মারছে, কি সব বলছে, জবাবে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে মাথা দোলাচ্ছে ডান হাত। এই সুযোগে জানালার আরও কাছে মুখ এগিয়ে নিল রানা, গোটা রুমটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। আরও ছয়জন আছে ভেতরে—দু'জন সশস্ত্র গার্ড ও চারজন টেকনিশিয়ান। এরা সাদা গাউন পরে আছে, খুব সম্ভব কন্ট্রোল অ্যাসেম্বলিঙের কাজ করছিল লোকগুলো।

রানার উদ্দেশে নীরবে মাথা ঝাঁকাল সোহানা, জবাবে ফেলে আসা দরজাটা দেখাল ও। পিছিয়ে এসে ওটার সামনে দাঁড়াল দু'জনে। খুব সাবধানে ডোর হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে পরখ করে দেখল রানা—খোলা! পুরু কাঠের পাল্লাটা নিঃশব্দে চুল পরিমাণ ফাঁক করল প্রথমে, তারপর আরেকটু, আরও একটু। কোন বাধা এল না

দেখে চট করে নজর বুলিয়ে নিল। কেউ নেই। ঢুকে পড়ল ওরা। এটা একটা করিডর। অন্ধকার, ঠাণ্ডা।

'...তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে,' পাশের রুম থেকে কবীর চৌধুরীর গলা ভেসে এল। বিরক্ত, ক্রুদ্ধ। 'কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা করা না গেলে নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরে চলে যাবে ওয়েদার,' আবার বলল সে। 'এমনকি আমারও আর কিছু করার থাকবে না।'

'তাহলে ট্রান্সমিটার শাট ডাউন করে দিলে...' শুরু করেছিল টোচেল। থামিয়ে দিল তাকে কবীর চৌধুরী।

'উজবুকের মত কথা বলছ তুমি!'

'সেনিয়র!' নরম, বিনীত গলায় বলল টোচেল, 'আমি বলতে চাইছিলাম, সেকশন আর-এর হাতে প্রয়োজনীয় কম্পোনেন্টস নেই। ওটা এমুহূর্তে নতুন করে বানানোর উপায়ও নেই। তাই...'

'তোমার এতবড় সাহস, আমার কাজ সম্পর্কে আমাকেই জ্ঞান দিচ্ছ!' হুঙ্কার ছেড়ে উঠল কবীর চৌধুরী। 'আমাকে শেখাতে এসেছ কি আছে কি নেই!'

কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা। আবার সে-ই মুখ খুলল। 'যা আছে তাই দিয়েই এটাকে রিওয়্যারিং করতে হবে আমাদেরকে। তাছাড়া সেকেন্ডারি ট্রান্সমিটার তো রইলই। ওটা দিয়েই কাজ চালিয়ে নেয়া যাবে কিছু সময়ের জন্যে। সবাই শুনে রাখো, আর কারও মুখ থেকে কোন ধরনের পরামর্শ শুনতে চাই না আমি। বোঝা গেছে?' আবার ক্ষণিকের নীরবতা।

'গুড! আমি জীবনে কখনও হাল ছাড়িনি। হালছাড়া কাকে বলে আমি জানি না। গোটা পৃথিবী বরফে তলিয়ে গেলেও আমার কাজ আমি চালিয়ে যাব। এখন যা ঘটছে, সে জন্যে আমি দায়ী নই। দায়ী ওই মাসুদ রানা। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু। আমার প্রতিটা সাধনার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। ও বাগড়া না দিলে...' নিজে থেকে ভাষণ থামাল কবীর চৌধুরী।

'রিপোর্ট এসেছে মাসুদ রানার সাথে একটা মেয়েও আছে। খুবই নাকি সুন্দরী।'

'ও সোহানা। মাসুদ রানার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। আরেক স্পাই।'

'ওরা যদি এখানেও...'

'এই ঝড়ের মধ্যে? অসম্ভব! আর যদি কোন অলৌকিক উপায়ে এসেই পড়ে, তাহলে ওদেরকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা জানাব আমি। অন্য সব স্টেশন জানত না, তাই কাজ সেরে নির্বিঘ্নে কেটে পড়তে পেরেছে ওরা। কিন্তু এখন আমরা জানি ওরা এখানে আসতে পারে। তোমাদের ঢিলেমির সুযোগে মসকুইটো কোস্টে আরেকটু হলে...' আবারও থেমে গেল কবীর চৌধুরী।

কি ভাবে শুরু করবে ভাবছিল রানা। হঠাৎ পরিস্থিতি সাহায্য করল সিদ্ধান্ত নিতে। একজোড়া বুটের শব্দ উঠল পাশের ঘরের মেঝেতে, তারপর কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুম্ করে করিডরের ও মাথায় হাজির হলো গার্ডদের একজন। ওদেরকে দেখতে পেয়ে মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল লোকটা, পরক্ষণে কাঁধ থেকে রাইফেল নামাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

কোমরের কাছ থেকে গুলি করল রানা। সোহানার স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনও একযোগে গর্জে উঠল, ফলে বোঝা গেল না কার গুলি আগে খেয়েছে গার্ড। রানার গুলি কণ্ঠার নরম মাংসে খেল সে, সোহানারটা বাঁ চোখ দিয়ে সেঁধিয়ে গেল খুলির মধ্যে। পুতুলের মত প্রায় খাড়া অবস্থায় উল্টে পড়ল লোকটা, রাইফেল ছিট্‌কে পড়ল হাত থেকে। মেঝেতে খটাখট্ শব্দ তুলে ছুটে গিয়ে বাড়ি খেল দেয়ালে।

কিন্তু এত কিছু দেখার সময় নেই, তার আগেই ছুটতে শুরু করেছে রানা খোলা দরজা লক্ষ্য করে। সোহানা রয়েছে ওর পিছনেই। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভেতরে ঢুকল ওরা। দ্বিতীয় গার্ড বাইরের গুলির শব্দেই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রানাকে ঝড়ের বেগে ঢুকতে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে।

ওইটুকু সময়ই যথেষ্ট ছিল ওর জন্যে, পরপর দুই গুলিতে লোকটার হৃৎপিণ্ড ঝাঁঝরা করে দিল ও।

পরমুহূর্তে পিছনের খোলা কেবিনেট ও কন্ট্রোল বোর্ড লক্ষ্য করে কয়েকটা গুলি করল। স্পার্ক করল কন্ট্রোল বোর্ড, পরক্ষণে দুম্ করে বিস্ফোরিত হলো। ধোঁয়ায় ভরে গেল চারদিক, কেবিনেটও বিস্ফোরিত হলো। ওদিকে সোহানার একের পর এক গুলিতে টেবিলের ওপরের সবকিছু চুরমার হয়ে গেল। পুরো ব্যাপারটা ঘটতে সময় লাগল বড়জোর দুই সেকেন্ড।

সামলে নিয়ে কাছের এক ছোট টেবিলের দিকে ঝাঁপ দিল টেকনিশিয়ানদের একজন, একটা পিস্তল তুলে নিয়ে ঘুরল এক হাঁটুতে ভর দিয়ে। কিন্তু মাঠে মারা গেল তার স্টান্টম্যান মার্কা অ্যাকশন, সোহানার এক গুলিতে ওখানেই শুয়ে পড়ল সে। এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। তার লালচে হলুদ মগজে ফ্লোর মাখামাখি।

ওদিকে দরজায় রানার আছড়ে পড়ার শব্দেই বসে পড়েছিল চিতার মত ক্ষিপ্র টোচেল, সোহানার গুলি থামতেই একটানে টেবিলটা ফেলে দিয়ে কবীর চৌধুরীকে নিয়ে ওটার মজবুত টপের আড়ালে চলে গেল সে। কোমরে গোঁজা নিজের .৩৫৭ ম্যাগনাম বের করে সমানে জবাব দিতে শুরু করল। বাকি দুই বিস্মিত, হতভম্ব টেকনিশিয়ান ছায়ায় মিশে গিয়ে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে, সোহানার স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন স্তব্ধ করে দিল তাদেরকে।

টোচেলের কামানের হাত থেকে বাঁচতে এক পাশে ডাইভ দিয়ে পড়ল রানা, প্রথম রিভলভারের গুলি শেষ হয়ে যাওয়ায় ওটা ছুঁড়ে মারল লোকটার মাথা সই করে। টেবিলের আড়াল থেকে মাথা বের করে ওর গতিবিধি লক্ষ্য করছিল সে, ভারী অস্ত্রটা নাকের কয়েক ইঞ্চি নিচে টেবিলে জোর 'ঠক!' শব্দে আছড়ে পড়তে চমকে উঠে ঝপ্ করে ডুব দিল।

এদিকে আরেকটা অস্ত্র বের করে নিয়েছে রানা, কিন্তু ওটা তোলার সময় পেল না। তার আগেই সশরীরে আক্রমণ করে বসল কবীর চৌধুরী। ওকে রিভলভার ছুঁড়ে মারতে দেখেই ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল সে, যেন হার্ডল রেস দিচ্ছে, এমনি অনায়াস ভঙ্গিতে এক লাফে টেবিল টপ্‌কে এপাশে চলে এল। রানা প্রস্তুত হতে পারার আগেই ছুটে এসে খ্যাপা ষাঁড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর।

উঠে বসতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু চৌধুরীর ভারী দেহের ধাক্কা সামলাতে না পেরে পড়ে গেল হুড়মুড় করে। সে-ও পড়ল ওর ওপর। রিবকেজের সামান্য নিচে চৌধুরীর হাঁটুর বেমক্কা গুঁতোয় ফুসফুসের সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল ওর। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রানা, চোখে আঁধার দেখতে শুরু করল। টের পেল হাতের অস্ত্র উড়ে গেছে। ধস্তাধস্তিতে তৃতীয়টাও পড়ে গেল কোটের পকেট থেকে।

শক্ত কপাল দিয়ে ওর নাকেমুখে দড়াম করে মেরে বসল কবীর চৌধুরী। 'আজ তোমার নিস্তার নেই, মাসুদ রানা!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল। 'অনেক ভুগিয়েছ। আজ কড়ায় গণ্ডায় তার হিসেব বুঝে নেব আমি।' মত্ত বাইসনের মত ফোঁস ফোঁস করছে। এদিকে রানার ঠোঁট ফেটে রক্ত গড়াতে শুরু করেছে।

আঘাতটা অনেক কষ্টে হজম করল ও. কাঁধের ব্যথা অগ্রাহ্য করে বাঁ হাতে খপ্ করে তার এক খাব্‌লা চুল মুঠো করে ধরে অন্য হাতের হীল সবেগে ওপরদিকে চালাল। নাকের হাড় ভাঙার মৃদু শব্দে সন্তুষ্ট হলো ও। যন্ত্রণায় চাপা কণ্ঠে গুঙিয়ে উঠল কবীর চৌধুরী, বিপদ টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঝট্ করে মাথাটা পিছিয়ে নিল যাতে ভাঙা ব্রিজ বোন বা কার্টিলেজ মগজে সেঁধিয়ে যাওয়ার সুযোগ না পায়।

মানুষটার রিফ্লেক্স অবাক করল রানাকে। মাথা পিছিয়ে নিয়েই কাঠের হাঁটু দিয়ে ওর তলপেটে ভয়ঙ্কর এক গুঁতো মারল সে, উন্মত্তের মত হাত চালাল ওর চোখ উপড়ে নেয়ার জন্যে। মাথা ঘন ঘন এপাশ ওপাশ করে তাকে ব্যর্থ করে দিল রানা। পরস্পরকে বজ্র আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধরে গড়াগড়ি খেতে লাগল দু'জনে। ওদিকে সোহানা ও টোচেল পরস্পরকে লক্ষ্য করে সমানে গুলি ছুঁড়ছে। মুহূর্তে মুহূর্তে ফ্ল্যাশ করছে ওদের অস্ত্র, ক্ষিপ্ত বোলতার মত ঘরময় এলোপাতাড়ি ছোটাছুটি করছে বুলেট।

তবে দুজনেই ফ্লোরের অন্তত চার ফুট ওপর দিয়ে গুলি করছে সেমসাইড হয়ে যাওয়ার ভয়ে। বেশ কিছু সময় কোস্তাকুস্তির পর কায়দামত একটা সুযোগ পেয়েই কবীর চৌধুরীর উন্মুক্ত দু'পায়ের ফাঁকে ধাঁই করে ওপরমুখো ঘুসি ঝেড়ে দিল রানা। 'হুঁক্!' করে উঠল লোকটা, ব্যথায় হাঁ হয়ে গেছে। আবার মারল ও। থুতনিতে এক্স ব্যান্টামওয়েট চ্যাম্পিয়নের ভয়ঙ্কর এক আপারকাট খেয়ে ওর বুকের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল কবীর চৌধুরী।

ঠিক সেই মুহূর্তে গুলি করে ঘরের একমাত্র আলো চুরমার করে দিল টোচেল, ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল চারদিক। বিপদ টের পেয়ে চৌধুরীর অবস্থান লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল রানা, কাজ হলো না। নেই লোকটা। মুহূর্তের সুযোগে সরে পড়েছে জায়গা ছেড়ে।

বাইরে কোথাও সাইরেন বাজছে, ঝড়ো হাওয়ায় কখনও চড়া শোনাচ্ছে, কখনও শোনাচ্ছে ক্ষীণ। অন্ধকারে রানা-সোহানা দিশে হারিয়ে ফেললেও কবীর চৌধুরী ও তার ডান হাতের কোন সমস্যা হলো না। নিঃশব্দে রুম থেকে বেরিয়ে গেল তারা। তবে শেষ মুহূর্তে কোন একজনের অসতর্কতার দরুন শব্দ হলো দরজায়।

একটা অস্ত্রের জন্যে হন্যে হয়ে মেঝে হাতড়াতে লাগল রানা। মূল্যবান কয়েক সেকেন্ড অপচয় হওয়ার পর একটা পাওয়া গেল, ওটায় গুলি আছে না নেই দেখতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না ও, তুলেই আন্দাজে দরজা সই করে ট্রিগার টেনে দিল। লাথি খাওয়া কুকুরের মত কেঁউ করে উঠল কে যেন, তারপরই ধুপ্‌ধাপ্ পায়ের শব্দ—মিলিয়ে যাচ্ছে। উঠে পড়ল রানা, কোটের আস্তিনে ঠোঁটের

রক্ত মুছে ডাকল, 'সোহানা!'

'এই যে,' খুব কাছ থেকে সাড়া দিল ও। 'এখানে।' এক হাত বাড়িয়ে ওকে ধরল।

হোঁচট খেতে খেতে অন্ধকার করিডরে বেরিয়ে এল দু'জনে। শুনতে পেল ইনার কোর্টইয়ার্ডে কবীর চৌধুরীর গার্ড বাহিনী ছোটাছুটি করছে, উঁচু-নিচু পর্দায় বাজছে সাইরেন। দৌড় দিল ওরা। কয়েক পা সবে গিয়েছে, এই সময় দড়াম করে পিছনের দরজাটা খুলে গেল, একজোড়া গান ফ্লেম ঝলসে উঠল।

দৌড়ের ওপর গুলি করল রানা, একটা ফ্লেম ঝাঁকি খেল দেখে সন্তুষ্ট হলো। করডাইটের কড়া গন্ধ এসে ঝাপ্টা মারল নাকে। করিডরের অন্য প্রান্তের দিকে ছুটল ও ইনার কোর্টইয়ার্ডে যাওয়ার জন্যে। চারদিকে চিৎকার-চেঁচামেচি চলছে। কোনটা ক্ষিপ্ত, কোনটা হতাশ, তার সাথে দুদ্দাড় দৌড়ের শব্দও আছে। কোথাও কেউ একজন আছড়ে পড়ল, আরও কিছু একটা পড়ল তার সাথে, ভাঙাচোরার শব্দ উঠল।

কাছেই গুলি হলো, দরজার ভাঙা কাঠের টুকরো এসে লাগল ওদের ঘাড়ে-মাথায়। কিন্তু থামল না রানা, দেয়াল ঘেঁষে ছুটছে। সোহানা ওর ঠিক পিছনেই রয়েছে। ঝড়ের বেগে ইনার কোর্টইয়ার্ডে বেরিয়ে এল ওরা, আগেই বাছাই করে রাখা বড়সড় এক প্যাকিং বাক্সের স্তূপের আড়ালে গা ঢাকা দিল। এগুলোয় প্যাক হয়ে কবীর চৌধুরীর যন্ত্রপাতি এসেছে নিশ্চয়ই। পুরু স্ল্যাব ও মেটাল ব্যান্ড আছে ওগুলোর সাথে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রফতানী করার স্ট্যান্ডার্ড ক্রেট।

বাইরে অন্ধের মত গুলি ছুঁড়ছে কবীর চৌধুরীর গার্ড বাহিনী—আন্দাজে। ওদের অবস্থা দেখে রানার সন্দেহ হলো শত্রু কে বা কারা, সে ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই ব্যাটাদের। কারও নির্দিষ্ট কোন নির্দেশও পায়নি হয়তো। গুলির জবাব গুলি দিয়ে দিতে হয় জানে, তাই দিচ্ছে। এত গুলি ফুটছে, এত শব্দ হচ্ছে,

মনে হয় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেছে বুঝি।

অবশ্য ওদের দু'জনকে দৌড়ে পালাতে দেখে শত্রু চিনতে পারল লোকগুলো। সেদিকে মন দিল একযোগে। অনবরত গুলি খেয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে বাতাসে উড়ে বেড়াতে লাগল ক্রেটের স্প্লিন্টার। ঘাবড়াল না রানা, জানে সামনের দেয়াল ভেদ করে গুলি পৌঁছবে না এতদূর, যদি সরাসরি এসে না লাগে।

ওদের পিছনের কোন ভবনের ঢালু টাইলের ছাদ থেকে যদি গুলি ছোঁড়া হয়, তাহলে সে আশঙ্কা আছে। সোহানাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে বলে সামনে নজর দিল ও। বাগানের হোস পাইপ দিয়ে পানি ছোঁড়ার মত গুলি করছে ব্যাটারা। অথচ ওদের গুলি ফুরিয়ে এসেছে। যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই গার্ড দেখে ভয় ধরে গেল মনে।

এত গোলাগুলির মধ্যেও বিশেষ একটা আওয়াজ শুনতে পেল রানা। ইলেকট্রিক স্টার্টারের আওয়াজ। দূর থেকে পার্ক করা কপ্টারের রোটর ব্লেড অলস ভঙ্গিতে ঘুরতে শুরু করেছে দেখল ও। পালাচ্ছে কবীর চৌধুরী!

কিন্তু এই অবস্থায় তাকে ঠেকানোর কোন উপায় দেখতে পেল না। ওটার বুদ্বুদের মত প্রায় গোল্ড পার্সপেক্সের ডোমের ভেতরে দুটো কাঠামো চোখে পড়ল। বাইরে এক গার্ড ব্যস্ত হয়ে ওটার বাঁধন খুলছে। কুড়িয়ে পাওয়া অস্ত্রটা ছিল ও ব্যাটারই, হাত থেকে ছুটে গিয়েছিল। এ মুহূর্তে একটামাত্র বুলেট আছে ওটায়। লোকটাকে সাবধানে টার্গেট করল রানা, হাতের কাজ থামাতে হবে তার।

গুলি করল, সঙ্গে সঙ্গে লোকটা এমন চিৎকার আর তিড়িংবিড়িং শুরু করে দিল যে অন্য গার্ডরা গুলি থামিয়ে তার দিকে তাকাতে বাধ্য হলো। লোকটার বিদঘুটে নাচ দেখে ডানা ছেঁড়া প্রজাপতির কথা মনে পড়ল রানার। রিভলভার ফেলে পকেট থেকে শেষ পিস্তলটা বের করল ও। দ্রুত চেক করে দেখল ফুল

লোডেড। ছয়টা বুলেট আছে। কপ্টার লক্ষ্য করে তুলল ও। ঘুরে কপ্টারের দিকে তাকাল সোহানা। 'এই ঝড়ে ওটা উড়তে পারবে না।'

'হয়তো না,' রানা বলল। 'কিন্তু সেই ভরসায় বসে থাকলেও চলবে না। কবীর চৌধুরী পালাচ্ছে। যদি সফল হয়, আবার নতুন দুর্ভোগ হয়ে দেখা দেবে। সবচে' বড় কথা, ট্রান্সমিটার অন্য দেশেই পালাচ্ছে ও।'

বিস্মিত হলো সোহানা। 'ট্রান্সমিটার! ওটা না আমরা···'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি বলছি সেকেন্ডারি ট্রান্সমিটারের কথা। ওটার ব্যাপারে কবির চৌধুরী তখন কি বলছিল ভুলে গেলে?'

'ও, হ্যাঁ! তাই তো!' ডানদিকের চুল কানের পিছনে গুঁজল সোহানা। 'কিন্তু··· সেটা কোথায় থাকতে পারে?'

'মনে হয় ওর সাথেই আছে। ওটার কিছু ব্যবস্থা করা না গেলে ওয়েদার আরও খারাপ হতেই থাকবে।

ওদিকে ততক্ষণে পূর্ণগতি লাভ করেছে কপ্টারের রোটর। কয়েক মুহূর্ত উড়ি-উড়ি করে অবশেষে উড়ল ওটা। কিছুক্ষণ অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাত হয়ে ঝুলে থাকল, যেন বুঝে উঠতে পারছে না কোনদিকে যাবে। দমকা বাতাসে বারবার কেঁপে উঠছে ওটা, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে চাইছে। হঠাৎ প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা খুলে গেল কপ্টারের, উন্মত্ত আচরণ করতে লাগল ওটা বাতাসের চাপে। ওখানে দীর্ঘদেহী, হালকা-পাতলা টোচেলকে দেখা গেল।

দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল সে। হিঞ্জের দিকে অর্ধবৃত্তের মত বাইরে বেরিয়ে থাকা দরজার ফাঁকা অংশের মধ্যে ভারী বুটসহ ডান পা ভরে দিয়ে ওটাকে ঠেকিয়ে সামনে মন দিল। চেঁচিয়ে কিছু বলল কবীর চৌধুরীকে। পাইলটের দায়িত্বে রয়েছে সে। টোচেলকে ম্যাগনাম তুলতে দেখে প্রমাদ গুণল রানা। বুঝতে পেরেছে কি করতে চাইছে ওরা।

'হারামজাদা!' অসহায় আক্রোশে চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'কুত্তার বাচ্চা! সোহানা, সাবধান! মাথা নিচু করে রাখো!'

'ভেবো না,' শান্ত গলায় বলল ও। 'আমি সতর্ক আছি।'

সামনে তাকাল রানা। সময় নেই। সিদ্ধান্ত যা নেয়ার, মুহূর্তের ভগ্নাংশের মধ্যে নিতে হবে। আড়াল ছেড়ে বের হলে গার্ডদের হাতে মরতে হবে, আবার জায়গায় বসে থাকলেও টোচেলের গুলি খেয়ে মরতে হবে। হতাশ, অসহায় বোধ করল ও। একই মুহূর্তে নড়ে উঠল কপ্টার, একটু পাশ ফিরে লেজ উঁচু করে এগিয়ে আসতে লাগল।

অজান্তেই চিৎকার করে কিছু বলে উঠল রানা, কিন্তু কি বলল নিজেই জানে না। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা বাগিয়ে ধরে ব্যগ্র হাতে কয়েকটা ক্রেট সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ার সংগ্রামে লেগে পড়ল। বেকায়দা টান পড়তে ওপরের দিকের একটা গড়িয়ে এসে একেবারে ওর আহত কাঁধের ওপরই পড়ল। অসহ্য ব্যথায় চিৎকার করে উঠল ও।

সামলে ওঠার আগেই ডান পা পিছলে গেল নিচের একটা ক্রেট স্থানচ্যুত হতে। কয়েক গড়ান দিয়ে হুড়মুড় করে একেবারে উন্মুক্ত ইয়ার্ডে এসে পড়ল রানা। মুহূর্তের জন্যে সম্পূর্ণ আঁধার হয়ে গেল চারদিক। কিন্তু মৃত্যুভয়ের কাছে পরাজিত হলো ব্যথা, ভেতরের কোন শক্তি চোখ মেলতে বাধ্য করল ওকে। তাকাতেই টোচেলের সাথে চোখাচোখি হলো।

লোকটা ধরে নিয়েছিল গার্ডদের কারও গুলি খেয়ে পড়ে গেছে রানা, কিন্তু একটু পর ব্যাপারটা অন্য কিছু বুঝতে পারামাত্র ভয়ঙ্কর শীতল হাসি ফুটল তার সরু মুখে। ম্যাগনাম তুলেই গুলি করল। কোটের বাঁ আস্তিনে পরপর কয়েকটা প্রচণ্ড টান অনুভব করল রানা। হাতের অস্ত্র উড়ে কয়েক গজ দূরে গিয়ে পড়ল। ক্রেট সরাতে ওটা বাঁ হাতে নিয়েছিল, সেই হাতেই আবার গুলি খেয়েছে। যদিও মাংসে ঢোকেনি বুলেট, কনুইয়ের কাছে কোটের

হাতা ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু ওতেই জ্ঞান হারানোর দশা রানার।

টোচেলের অট্টহাসি কানে এল। 'ওটা তোলো, মাসুদ রানা!' বলল সে। 'বাঁচতে চাইলে তাড়াতাড়ি তুলে নাও।'

তার পরামর্শে নয়, নিজের গরজেই ঝাঁপ দিল ও। দাঁতে দাঁত চেপে কয়েক গড়ান দিয়ে তুলে নিল, পরক্ষণে আরেক গড়ানে চিত হয়েই গুলি করল। একটু বিরতি দিয়ে আবার। অস্ত্রটার সাথে যেন নিজের অস্তিত্বকেও ফিরে পেয়েছে ও. ফিরে পেয়েছে বেঁচে থাকার উদগ্র আকাঙ্ক্ষাও। কিন্তু নিজেকে এ মুহূর্তে দু'জন মনে হচ্ছে—বাঁ দিকের জন অসাড়. প্রায় মৃত। ডানদিকের জন বেঁচে আছে। ধীরস্থির, হিসেবী সে। মৃত অংশের ক্ষত সম্পর্কে একেবারে নির্বিকার।

ওর দ্বিতীয় গুলির সাথে সাথে দুলে উঠল কপ্টার। প্রচণ্ড বাতাসে ওটাকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না কবীর চৌধুরী, তাছাড়া রানার সরাসরি গুলির মুখে পুরোপুরি নিরাপদও বোধ করছে না। 'গুলি করো ওকে!' চেঁচিয়ে বলছে সে। 'গুলি করো. টোচেল! শেষ করে দাও।'

তাই করত মেসতিজো. কিন্তু ঠিক সময়মতই বাতাসের ঝাপটায় কেঁপে উঠল কপ্টার। একটা গুলিও পৌঁছল না রানার ধারেকাছে। এদিকে সোহানা একটা ক্রেটের আড়ালে প্রায় সেজদার ভঙ্গিতে বসে আছে, ভয়ে চেহারা ফ্যাকাসে। টোচেলকে ম্যাগনাম তুলতে দেখে ওর পাশে সরে এসেছিল রানা, যখন বুঝল লোকটা ব্যর্থ হয়েছে, মুখ বের করে তৃতীয় গুলিটা ছুঁড়ল। পরক্ষণে আড়ষ্ট হয়ে উঠতে দেখল টোচেলকে। বুক চেপে ধরে ঝুঁকে পড়ল লোকটা ডাইভ দিতে যাওয়ার ভঙ্গিতে।

এক হাতে ডোর ফ্রেম আঁকড়ে ধরে রেখেছে, দু'চোখ কোটর ছেড়ে ঠিকরে পড়ার জোগাড়। আপনা থেকে ম্যাগনামের ট্রিগারে তর্জনী চেপে বসল তার, কিন্তু গুলি ফুটল না। খালি হয়ে গেছে

চেম্বার। আরও ঝুঁকে পড়ল টোচেল, হাত ছুটে গেল ডোর ফ্রেম থেকে। শূন্যে দর্শনীয় এক ডিগবাজি খেয়ে সাঁ করে নিচে নেমে এল। মাটিতে আছড়ে পড়ল, তার হাড় ভাঙার মট্ মট্ শব্দ উঠল কয়েকটা। কিন্তু টুঁ শব্দও করল না সে, মারা গেছে শূন্যে থাকতেই।

সবে নতুন উদ্যমে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছিল গার্ড বাহিনী, এই দৃশ্য চাক্ষুষ করে আবার থেমে গেল। অশুভ নীরবতা নেমে এল। কপ্টারের গুঞ্জন, বাতাসের গোঁ-গোঁ আর সমুদ্রের দূরাগত গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই কপ্টারের আওয়াজ চড়ে গেল—উঠে পড়তে শুরু করেছে কবীর চৌধুরী। পিছিয়ে যাচ্ছে কাত হয়ে, দেখতে দেখতে আবছা হয়ে উঠল তুষারপাত ও শিলাবৃষ্টির আড়ালে।

আর কয়েক সেকেন্ড সময় পেলেই হারিয়ে যাবে কবীর চৌধুরী। তাই গার্ডদের গুলির ভয় উপেক্ষা করে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসল রানা। বাঁ কাঁধ প্রচণ্ড ব্যথায় আড়ষ্ট, দুর্বলতার কারণে মাথা ঘুরছে, একটু একটু ঝাপসা দেখছে সব। কোন কিছুকে পাত্তা দিল না, একের পর এক গুলি করতে লাগল কপ্টার লক্ষ্য করে। তিনটে গুলি হলো, তারপরই খট্! গুলি শেষ।

মুহূর্তের জন্যে ভয় হলো দেরি করে ফেলেছে ও, রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে হয়তো কপ্টার। কিন্তু না, হঠাৎ মেইন রোটর অদ্ভুত সব আওয়াজ করতে শুরু করল। গোটা দেহ কাঁপছে কপ্টার, খাবি খাচ্ছে। ডোমের ওপাশে কন্ট্রোলের সাথে লড়াই করতে দেখল ও কবীর চৌধুরীকে। হঠাৎ এক ঝাঁকি খেয়ে অনেকখানি উঁচুতে উঠে পড়ল ওটা, মেইন হাউস বরাবর ওপরে।

ভয়ঙ্কর এক দোল খেয়ে কাত হয়ে সাঁই সাঁই করে নেমে এল পঞ্চাশ-ষাট ফুটের মত। চড়চড় শব্দ উঠল কিছু ভাঙার। বড় এক খণ্ড নিরেট স্টীলের টুকরো ছিট্কে আলাদা হয়ে গেল ওটার দেহ থেকে। ককপিটে ছোটখাট একটা বিস্ফোরণ ঘটল, পরক্ষণে

মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে গেল কপ্টার। এঞ্জিন কম্পার্টমেন্টের বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলো ছোট ছোট আগুনের শিখা দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে আবার ডাইভ দিল নিয়ন্ত্রণ হারা যান্ত্রিক ফড়িংটা। পড়ে যাচ্ছে।

মেইন হাউসের ঢালু ছাদে বিধ্বস্ত হলো ওটা। তার সামান্য আগে কবীর চৌধুরীকে ভেতর থেকে লাফিয়ে পড়তে দেখল রানা। তুখোড় অ্যাক্রোব্যাটের মত কপ্টারের সামান্য আগে ছাদে লাফিয়ে পড়ল সে, পরক্ষণে এক ডিগবাজি খেয়ে নিচে নেমে পড়ল। প্রায় একই মুহূর্তে টালির ছাদে আছড়ে পড়ল তার কপ্টার। সেঁধিয়ে গেল ভেতরে।

ভয়াবহ শব্দে বিস্ফোরিত হলো ওটা। কমলা রঙের অত্যুজ্জ্বল আগুন হুপ্! করে লাফিয়ে উঠল, ভবনের কাঠ ও টালির হাজারটা টুকরো ছিটকে উঠল আকাশে। শক ওয়েভের ধাক্কা খেয়ে কয়েক গজ দূরে আছড়ে পড়ল রানা। ভবনটার একদিকের পুরানো পাথরের দেয়াল কোর্টইয়ার্ডে এসে পড়ল, তার সাথে বীম, জানালাসহ এটা-সেটা অনেক কিছুই। পুরো ছাদ ধসে গেল, বাধা সরে যেতে দাউ দাউ আগুন লাফ দিয়ে উঠে পড়ল অনেক উঁচুতে।

ধাক্কা সামলে নিয়ে উঠল রানা। হাড়গোড় ভাঙেনি দেখে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল মনে মনে। তবে কাঁধের ক্ষত থেকে আবার রক্তপাত শুরু হয়েছে। আপাতত সেদিকে নজর দেয়ার সময় নেই, সশব্দে দম নিতে নিতে ক্রেটের স্তূপের দিকে এগোল ও। পালাতে হবে সোহানাকে নিয়ে। ওকে অক্ষত দেখে খুশি হলো রানা।

ওদিকে বাতাসে আগুন খুব দ্রুত ছড়াচ্ছে। তার আভায় গার্ডদের বিক্ষিপ্ত ছোটাছুটি দেখতে পেল রানা। কোনদিক যাবে বুঝে উঠতে পারছে না লোকগুলো। নেতাদেরকে হারিয়ে বিশৃঙ্খলে হয়ে পড়েছে, লড়াই করার ব্যগ্রতা হারিয়ে ফেলেছে। এখন নায়ক

হতে গিয়ে সেধে মৃত্যু ডেকে আনার ইচ্ছে নেই কারও। তবে যত ভীত আর নেতৃত্বহীনই হোক, রানা-সোহানাকে এখনও নিশ্চয়ই শত্রু হিসেবেই দেখছে ওরা। কারও মধ্যে হয়তো ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলার ইচ্ছে জাগতেও পারে।

এখনই এখান থেকে পালাবার উপযুক্ত সময়। কাজেই সোহানাকে নিয়ে সবচেয়ে কাছের বিল্ডিংটার দিকে ছুটল রানা। ওদের ধারকাছ দিয়েই এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছে গার্ডরা, অথচ কেউ আমলই দিল না। পিছনদিক দিয়ে জ্বলন্ত মেইন হাউসের কাছে পৌঁছল ওরা, কবীর চৌধুরীর সর্বশেষ ট্রান্সমিটারটা ধ্বংস হয়েছে কি না জানতে হবে।

কিন্তু সুযোগ হলো না। দু'জন হঠাৎ কর্তব্যসচেতন গার্ড দূর থেকে ওদের দেখতে পাওয়ামাত্র চিৎকার করে কিছু বলল সঙ্গীদের উদ্দেশে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা রাইফেল গর্জে উঠল। ওদের কানের পাশ দিয়ে গুঞ্জন তুলে ছুটে গেল বুলেট, পোর্টিকোর পাথরের দেয়ালের ছাল চামড়া তুলে নিয়ে যেতে থাকল। বিপদ দেখে দিক বদলাল রানা, সোজা মেইন গেটের দিকে ছুটল। পিছন পিছন তেড়ে আসছে একদল গার্ড, মহাউৎসাহের সাথে গুলি ছুঁড়ছে, তবে সৌভাগ্য যে বেশ পিছনে রয়েছে লোকগুলো।

প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। পুরু কাঠের দরজা দড়াম করে লাগিয়ে দিল রানা, সোহানার হাত ধরে পিচ্ছিল, ঢালু পথ বেয়ে প্রায় উড়ে নামতে শুরু করল। বাইরে বাতাসের গতি আরও জোরাল মনে হলো রানার, কানের কাছ ঘেঁষে তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। পিছনে আগুনের পড়পড় আওয়াজ।

টিলা থেকে নামতে সমস্যা দেখা দিল। প্রায় সমতল, বড় বড় বোল্ডার ঢাকা জায়গাটায় বরফ জমে আছে পুরু হয়ে। সোহানা অন্তত ডজনখানেক বার আছাড় খেল, ওকে ধরতে গিয়ে খেল রানাও। ট্রেইল অনুসরণ করে কোভে পৌঁছল হাঁপাতে হাঁপাতে। ওখানে কিছু আছে কি না, সে ব্যাপারে কোন ধারণা নেই রানার।

তারপরও ক্ষীণ একটা ভরসা ছিল, হয়তো পালাবার মত কিছু একটা পাওয়া যাবে।

কোভের মুখে একটা বন্ধ দরজা দেখে সোহানাকে ইঙ্গিতে পাশে সরে দাঁড়াতে বলল রানা, নিজেও এক পাশে সরে এসে ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল ওটা। হাত সরিয়ে নিল চট্ করে। না, গুলি করল না কেউ। একটু পর নিশ্চিন্তে ঢুকে পড়ল রানা। ভেতরে কয়েক গজ চওড়া পাথরের মেঝে, তারপরই একটা কাঠের পন্টুন।

তার সাথে বাঁধা জিনিসটা দেখে চেপে রাখা দম ছাড়ল ও। একটা ত্রিশ ফুটী ঝক্‌ঝকে, প্রায় নতুন বোট। দড়ি দিয়ে বাঁধা, সদ্য পাকড়াও করা বুনো স্ট্যালিয়নের মত লাফঝাঁপ দিচ্ছে উল্টোপাল্টা ঢেউয়ে। এগোতে পাচ্ছিল ও, হঠাৎ পন্টুনের কয়েক জায়গায় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দেখে থমকে গেল।

কবীর চৌধুরীর রক্ত! ভাবল ও।

কিছু বলার জন্যে ঘুরে তাকিয়েছিল সোহানা, থেমে গেল। ওরও চোখে পড়েছে রক্ত।

'এ নিশ্চই…?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কোন সন্দেহ নেই। এবারও তাহলে পালিয়ে গেল কবীর চৌধুরী!' শেষ বাক্যটা হতাশ কণ্ঠে উচ্চারণ করল।

'তার মানে বোট আরও একটা ছিল?'

মাথা দোলাল অন্যমনস্ক রানা। ভাবছে, কবীর চৌধুরী পালিয়েছে বোট নিয়ে। রানার তাকে অনুসরণ করার আশঙ্কা আছে জেনেও আরেকটা বোট রেখে গেছে সে। কেন? এটা কোন ফাঁদ নয়তো ওদের জন্যে?

পিছনে কয়েকটা কণ্ঠের হই-চই শুনে দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিল রানা। কম করেও দশ বারোজন গার্ড ছুটে আসছে। ফাঁকা গুলি ছুঁড়ছে কেউ কেউ। পৌঁছতে দেরি আছে অবশ্য।

দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে ভারী বোল্ট তুলে দিল ও, ফিরে এল পন্টুনে। 'জলদি করতে হবে। ওরা আসছে।' সময় নেই, তবু ধৈর্যের সাথে বোটটা সার্চ করল ও। না, যে ভয় ছিল তা অমূলক প্রমাণ হলো। কোন বোমা-টোমা পাতা নেই। অবশ্য লোকটা যে পরিস্থিতিতে এখানে পৌঁছেছে, তাতে থাকার কথাও নয়। তবু সাবধানের মার নেই বলে চেক্ করা। স্টার্ট দেয়ার সময় ব্যাপারটা চোখে পড়তে তিক্ত হাসি ফুটল ওর মুখে।

ফুয়েল গজের ইন্ডিকেটর একদম শুয়ে আছে। ট্যাঙ্ক প্রায় খালি, বোট পাঁচ মিনিটও চলবে কি না সন্দেহ। পানিতে ভাল করে চোখ বোলাতে ব্যাপারটা বোঝা গেল। তেল ভাসছে। অর্থাৎ কবীর চৌধুরীই ফুয়েল ট্যাঙ্ক খালি করে রেখে গেছে। শেষ সময়ে জবর এক রসিকতা করে গেছে লোকটা। বন্ধ দরজায় দমাদম শব্দে চমকে উঠল কোভ।

'এখন কি হবে?' সোহানা বলল হতাশ, শুকনো মুখে।

'সময় হলে দেখা যাবে,' বলল রানা। 'আগে বের তো হওয়া যাক!'

উন্মত্ত গালফ অভ পানামায় বেরিয়ে এল ওরা। পুরু, সাদা ফেনার প্রলেপ কেটে কেটে ছুটে চলল বোট। ঢেউ আর বাতাসের ধাক্কায় খানিক পরপরই বিপজ্জনক ভঙ্গিতে শুয়ে পড়ছে, ডুবে যেতে যেতেও পানিতে ভেজা কুকুরের মত আবার গা ঝাড়া দিয়ে সিধে হচ্ছে, চাপমুক্ত হয়ে ঝাঁপ দিচ্ছে সামনের দিকে।

পাঁচ মিনিট নয়, দশ মিনিট পর কয়েকবার কেশে উঠল এঞ্জিন, তারপর নীরব হয়ে গেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে পরম স্বস্তির সাথে মৃদু হাসল মাসুদ রানা। আবার বদলে যেতে শুরু করেছে আবহাওয়া। কবীর চৌধুরীর 'কালজয়ী আবিষ্কার' ধ্বংস করে দিতে পেরেছে ও।

'এখন কি হবে, রানা?' সোহানা বলল। 'বোট তো গেছে।'

সুস্থ হাতে ওকে কাছে টেনে আনল ও। চোখে চোখে তাকিয়ে

থাকল কয়েক মুহূর্ত। 'যাক্ না, কি এসে-যায়?'

'বাহ্, তীরে পৌঁছতে না পারলে...'

'দরকার কি তীরে পৌঁছার? এই তো বেশ আছি আমরা। তুমি আর আমি, আমি আর তুমি।'

দুই পেলব বাহু তুলে ওর গলা জড়িয়ে ধরল সোহানা। চোখের তারা ঝিলিক মারছে অব্যক্ত উচ্ছ্বাসে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে অবশ্য, তারপরই মিলিয়ে গেল।

'কিন্তু কতক্ষণ?' বিষাদ ফুটল ওর কণ্ঠে। 'কতক্ষণ, রানা? মিশন শেষ, তুমি চলে যাবে তোমার পথে, আমি আমার পথে। আবার কবে দেখা হবে কে জানে?'

উদাস হয়ে উঠল রানা। একটু পর বলল, 'এই তো জীবন, সোহানা। এরই নাম জীবন। এই নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে আমাদেরকে।'

ওর মন খারাপ হয়ে গেছে বুঝতে পেরে হাতের বাঁধন আরও দৃঢ় করল সোহানা। বলল, 'এই জন্যেই তো বিখ্যাত এক দার্শনিক বলেছেন, "নগদ পরিমাণে কম হলেও ভাল। নগদ যা পাওয়া যায়, তাতেই সন্তুষ্ট থেকো"।'

চোখ কুঁচকে উঠল ওর। 'এটা কোন দার্শনিকের উক্তি?'

'উঁমম্! খুব সম্ভব সোহানা চৌধুরীর।'

প্রাণখোলা হা-হা হাসিতে ফেটে পড়ল মাসুদ রানা। চমকে উঠে দিক বদল করল একটা পথভ্রষ্ট সী-গাল।

***

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

সার্বিয়া চক্রান্ত

কাজী আনোয়ার হোসেন

মার্সিডিজের দিকে ঘাড় ফেরাতেই মাসুদ রানার বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে স্টেন গানের ব্যারেল। ব্যারেলটা ঝাঁকি খেতে শুরু করল, সেই সঙ্গে নাচতে লাগল পুলিস হেডকোয়ার্টারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নিঃসঙ্গ এক তরুণী। তারপর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

রানা বেলগ্রেডে এসেছে টপ সিক্রেট একটা ডকুমেন্ট নিয়ে যেতে। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পাপিষ্ঠ নেতা কার্চিক জোড়া ওকে খুন করার জন্যে পাগলা কুকুর হয়ে উঠল। পুলিস চীফ দেবারভিল সিডাক সারাক্ষণ রানার সামনে হাত পেতে আছেন, ডকুমেন্টটা তাঁর চাই। ব্রিটিশ দূতাবাসের জেমস ফোলিও ভয় দেখাচ্ছে ওকে।

শুধু ডকুমেন্টটা নয়, সাঈদ মুর্তজায়েভকে নিয়েও পালাল রানা। শুরু হলো ধাওয়া।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী